সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব

ইমরান মাহমুদ

চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সেমিস্টার, কোর্স নং- ৪০৮ (বি) : Research Technique in language-literature & Manuscript editing এর অধীনে

গবেষণা পত্র

শিরোনাম-

সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাবঃ আরবী পদ্যসাহিত্যের আলোকে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

তত্ত্বাবধায়ক-
ড. এবিএম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ড. মু. নাসির উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক: ইমরান মাহমুদ
ক্লাস রোল- ০৫, পরীক্ষা রোল- **১১৬৬**
৮ম সেমিস্টার, চতুর্থ বর্ষ
আরবী বিভাগ, ঢাবি।

www.nagorikpathagar.org

১.ভূমিকা--- ৩

২.সাহিত্য

২.১ সাহিত্যের পরিচয়--- ৪

২.২ সাহিত্যের উপাদান---৬

২.৩ সাহিত্যের ধরণ/প্রকরণ---৭

৩.রাজনীতি

৩.১ রাজনীতির পরিচয়--৯

৩.২ রাজনীতির সীমা-পরিসীমা--১১

৩.৩ রাজনীতির দর্শন--১২

৩.৪ ভূ রাজনীতি --১৩

৩.৫ আরব রাজনীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস----------------------------------১৪

৪.আরবী সাহিত্য

৪.১ যুগ অনুসারে আরবী সাহিত্যের ইতিহাস----------------------------৫২

৪.২ বিভিন্ন যুগের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ----------------------------------৫৯

৪.৩ সাহিত্যিক ও রাজা-বাদশাহের সম্পর্ক বিশ্লেষণ---------------------৭২

৪.৪ সাহিত্যকর্মে রাজনৈতিক ছাপ---------------------------------------৭২

৫.সাহিত্যের দর্শন ও শেষকথা--৯৪

৬. গ্রন্থপুঞ্জি---৯৫

www.nagorikpathagar.org

১. ভূমিকা

সাহিত্য হল মনের কোণে জমে থাকা অনুভূতিগুলো লিখার মাধ্যমে প্রকাশ। কল্পনা, অনুভূতি, আবেগ সবকিছুর একটি লিখিত রূপ হল সাহিত্য। একজন সাহিত্যিক নিরবে নিভৃতে বসে তার মনের ভাবনাগুলো কাগজের ফ্রেমে বন্দি করে। অপরদিকে রাজনীতি সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ বিপরিত এক বস্তু। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচারলনার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত রাজনীতির পরিসীমা। রাজনীতিকে নিররে নিভৃতে নয়, আপন মনের গোপন চিন্তায় নয় বরং সবার সাথে আন্তযোগাযোগ, বুদ্ধি-পরামর্শ, মতবিনিময় ইত্যাদি কার্যক্রম রক্ষা করে রাজনীতিকে সামনে এগিয়ে নিতে হয়। কিন্তু সাহিত্য ও রাজনীতি দুটি দুই ভিন্ন মেরুর বস্তু হলেও একটির উপর অন্যটির প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও লক্ষণীয়। যেমন কোন যুগের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা কেমন ছিল সেটা সহজে অনুমান করা যায় সে যুগের সাহিত্য পাঠ করলে। উক্ত গবেষণায় আরবী পদ্যসাহিত্যকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করে যুগে যুগে সাহিত্যের উপর রাজনীতির কিরূপ প্রভাব ছিল তা অত্যন্ত সরলভাবে ফুটিয়ে তুলা হয়েছে। বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকগণের সাহিত্যকর্ম কিভাবে রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হত ইহা স্পষ্ট ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি মানুষের চিন্তা ধারায় কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাও সুস্পষ্টভাবে উক্ত গবেষণায় স্থান পেয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

২. সাহিত্য

২.১. সাহিত্যের পরিচয়

সাহিত্য শব্দের আরবী প্রতিশব্দ (الأدب)আদাব। ইংরেজি প্রতিশব্দ literature। তন্মধ্যে (الأدب)আদাব শব্দটি দ্বারা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ পেয়েছে।[1] যেমনঃ

ক. জাহেলি যুগে আদব শব্দটি 'খাবার গ্রহণের প্রতি আমন্ত্রণ' অর্থ প্রদান করত। এটি জাহেলি কবি ত্বরাফার কবিতার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

نحن في المشتاة ندعو الجفلى

لا تـــرى الآدب فينـــا يَنْتَقِــرْ

খ. ইসলামি যুগে আদব শব্দটি শিষ্টাচার, আচার-আচরণ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। রাসূল(সা) এর প্রসিদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে ইহা প্রমাণিত। **أَدّبني ربي فأحسن تأديبي** তথা আমার রব আমাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছে তাই আমার শিষ্টাচার বা আচরণ সুন্দর।

গ. উমাইয়া যুগে আদব শব্দটি শিষ্টাচার অর্থের পাশাপাশি জ্ঞান-দক্ষতা-শিক্ষা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, উমাইয়া যুগে যেসব জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা বাদশাহের গৃহশিক্ষক হিসাবে রাজপুত্রদের কবিতা, বক্তৃতা, বংশনামা, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন তাদেরকে বলা হত মুয়াদ্দিবিন(مؤدبين) আদবসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। এভাবে আব্বাসী যুগেও উক্ত দুটি অর্থের বহুলপ্রচলন ছিল। প্রখ্যাত কয়েকজন আরবী গ্রন্থাকারের সুপরিচিত বইয়ের মাধ্যমে আমরা বিষয়টা সহজে বুঝতে পারি। যেমন, ইবনে মুকাফফার 'আদাব আল কাছির ওয়াল আদাব আল সগির', আবু তাম্মামের দেওয়ানে হামাসার অন্তর্ভুক্ত 'বাবুল আদাব', ইবনে কুতাইবার 'উয়ুনুল আখবার'ইত্যাদি। অর্থাৎ উক্ত সময়ে আদব বলতে শুধু কবিতা-গল্প-প্রবন্ধের জ্ঞানকে বুঝানো হতনা বরং কুরান, হাদীস, ইতিহাস, আইন কানুন সহ যাদুবিদ্যা, ইথিকস, রসায়ন, পদার্থ, গণিত ইত্যাদি সকল বিষয়কে বুঝানো হত।

ঘ. ১৭৯৮সালে নেপোলিয়ন কর্তৃক মিসর আক্রমণের পর আরবী ভাষা যখন ইউরোপে চর্চা হতে শুরু করে তখন থেকে আদব শব্দটি ইংরেজি Literature এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

সাহিত্য এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Literature শব্দটি লাতিন Littera থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ইহাও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছে। শব্দটি সর্বপ্রথম গ্রীক শব্দ grammatiké এর অনুবাদে ব্যবহার করা হয়। একসময় শব্দটি 'লেখতে ও পড়তে জানা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেকোন বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতি অর্থেও শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে শব্দটির দ্বারা লিখিত সকলকিছুকে বুঝানো

1 عمر السنوي الخالدي،" ما الأدب؟"، **شبكة الألوكة** ، 7/5/2017م، https://www.alukah.net.

হত। যদিও প্রাচীনকালে একটা সময়ে শব্দটি কেবল গ্রীক সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলীকে অন্তর্ভুক্ত করত।[2]

আধুনিক আরবি অভিধান আল-মায়ানিতে আদব (**الأَدَبُ**) শব্দটির শাব্দিক ও পারিভাষিক দিক থেকে বহুমুখি ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে।[3]

- **الآدابُ العامة**: পছন্দনীয় প্রচলিত রীতি-নীতি।
- **آداب البحث والمناظرة** : বাহস-পর্যালোচনা বা বিতর্কের নীতিমালা বা পদ্ধতি।
- **بَيْتُ الأَدَب** : শৌচাগার, গোসলখানা।
- **قليل الأَدَب**: শিষ্টাচারবিহনীন, বেয়াদব।
- **رجال الأَدَب / أهل الأَدَب** : চিন্তাশীল মানুষ।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে সাহিত্য শব্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণের পর সামগ্রিকভাবে বর্তামান সময়ে সাহিত্য বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করা হল।

সাহিত্য মানে সহিতের ভাব, মিলন, যোগ। অন্য একটি বিশ্লেষণ মতে যা হিতকর বা হিতযুক্ত তাই সাহিত্য। পরিভাষায় লিখন-শিল্প ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য্য ও শিল্পের লিখিত প্রকাশকে সাহিত্য বলে।[4]

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে সাহিত্যের সংগায় বলা হয়েছে- "চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত লিখিত রূপ" [5]

সাহিত্য বলতে যথাসম্ভব কোন লিখিত বিষয়বস্তুকে বুঝায়। সাহিত্য শিল্পের একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়, অথবা এমন কোন লেখনি যেখানে শিল্পের বা বুদ্ধিমত্তার আঁচ পাওয়া যায়, অথবা যা বিশেষ কোন প্রকারে সাধারণ লেখনি থেকে আলাদা। মোটকথা ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতি হচ্ছে সাহিত্য।

উল্লেখিত সংগা ছাড়াও নিচে সাহিত্যের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ন পরিচয় দেয়া হল; যেগুলো বিষয়টাকে সুস্পষ্ট করতে সহায়তা করবে।

[2] أنور محمد أنور، الأدب العرب- الماضي و الحاضر، شبكة مستقبل مصر بالنمسا ، http://www.mmasr.net ، 23 نيسان/أبريل 2013.

[3] الأدب /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar.

[4] ইয়াকুব আলী, " সাহিত্য কাকে বলে", 21 জুলাই 2016, http://www.ans.bissoy.com/386232/

[5] সাহিত্য, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ত্রয়োদশ পুনর্মূদ্রণ: জানুয়ারি ২০১১।

ভিন্নভাবেও বলা যায়-

- **الأدب هو أحد أشكال التعبير الإنساني عن مجمل عواطف الإنسان وأفكاره وخواطره وهواجسه بأرقى الأساليب الكتابية التي تتنوع من النثر إلى النثر المنظوم إلى الشعر الموزون لتفتح للإنسان أبواب القدرة للتعبير عما لا يمكن أن يعبر عنه بأسلوب آخر.**
- **الأدب هو نوع من أنواع التعبير الراقي عن المشاعر الإنسانيّة التي تجول بخاطر الكاتب، والتعبير عن أفكاره، وآرائه، وخبرته الإنسانيّة في الحياة 6**

Oxford English Dictionary তে সাহিত্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ Literature বলতে বুঝানো হয়েছে-

- written works, especially those considered of superior or lasting artistic merit
- books and writings published on a particular subject[7]

২.২. সাহিত্যের উপাদান

সাহিত্যের উপাদান চারটি। যেমন: ১. চিন্তা ২. পদ্ধতি ৩. কল্পনা ৪. আবেগ।[8]

চিন্তা- সাহিত্যিকের মন থেকে যে কোন ধরণের সাহিত্য সৃষ্টিতে এই উপাদানটি প্রথম প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে একজন সাহিত্যেক কি লিখতে চান, তার সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠককে কোন বিষয়ে অবহিত করতে ইচ্ছাপোষণ করেন ইহা একান্তই লেখক তথা সাহিত্যিকের চিন্তার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ একজন কবি একটি কবিতা লিখল। এই কবিতার মাধ্যমে কি অর্থ প্রকাশ করতে চান ইহা কবি যেভাবে চিন্তা করবেন সেভাবেই প্রকাশ পাবে। শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন, বিষয়বস্তু নির্ধারণ ইত্যাদি সবকিছু লেখকের চিন্তার সাথে উতপ্রোতভাবে জড়িত।

পদ্ধতি- যে কোন কাজ সম্পাদনকালে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার হল কাজটি কোন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। একজন সাহিত্যিক তার সাহিত্যকর্ম কিভাবে ফুটিয়ে তুলবেন সেটি নির্ভর করবে সাহিত্যের পদ্ধতির উপর। কাব্যিক ছন্দে, গদ্যরীতিতে নাকি বক্তার বক্তব্যের মত করে। যদি কাব্যিক ছন্দে হয় তাহলে কোন ছন্দ অনুসরণ করা হবে। গদ্যরীতিতে হলে ইহা গদ্যের কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত হবে। উপন্যাস লিখতে ইচ্ছুক কোন ঔপন্যাসিক কোন ধরণের উপন্যাস লিখবেন; ঐতিহাসিক, সামাজিক নাকি রাজনৈতিক সবই সাহিত্যের পদ্ধতির উপর নির্ভন করে।

কল্পনা- সাহিত্যিকের কল্পনা সাহিত্যের সৌন্দর্য রক্ষা করে। একটি ঘটনাকে একজন সাহিত্যিক তার কল্পনার মাধ্যমে সুসজ্জিত করে থাকেন। সাহিত্যিকের কল্পনাই মূলত সাধারণ বর্ণনা আর সাহিত্যের

6 هديل البكري، "تعريف الأدب"، **الموضوع**، ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ ، https://mawdoo3.com.

7 Literature, Oxford English Dictionary.

8 روان الحربي وزملائها، "عناصر الأدب"، جامعة الملك السعود، https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/nsr_ldb.docx.

মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। কল্পনা কোন বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে হতে পারে আবার নিছক অস্তিত্বহীন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করেও হতে পারে।

আবেগ- মানুষের হৃদয়ানুভূতি যা কোন ঘটনা দেখা বা শুনার পর জাগ্রত হয়। ইহা কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। তাই কল্পনাকে আবেগ প্রকাশের মাধ্যম বলা হয়ে থাকে। সাহিত্য যদি আবেগহীন হয় এবং মনকে নাড়া দিতে না পারে তাহলে পাঠকের মনে বিরক্তি ভাব তৈরি হয়। লেখকের আবেগ পাঠকের মনকে কখনো আনন্দিত করে কখনো ব্যাথিত করে। আবেগে সত্য, মিথ্যা কিংবা উভয়ের সংমিশ্রণ থাকতে পারে।

২. ৩. সাহিত্যের ধরণঃ

সাহিত্যকে বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ করা হয়। যেমন: গদ্য, পদ্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদি। নিম্নে সংক্ষেপে এগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হল-

পদ্য- পদ্য হল সাহিত্যিক ধারার একটি রূপ, যা কোন অর্থ বা ভাব প্রকাশের জন্য গদ্যছন্দে প্রতীয়মান অর্থ না ব্যবহার করে ভাষার নান্দনিক ও ছন্দবদ্ধ গুণ ব্যবহার করে থাকে।[9] ছন্দোবদ্ধ বাক্য ব্যবহারের কারণে পদ্য সাহিত্য গদ্য থেকে ভিন্ন। গদ্য বাক্য আকারে লেখা হয়, পদ্য ছত্র আকারে লেখা হয়। গদ্যের পদবিন্যাস এর অর্থের মাধ্যমে বুঝা যায়, যেখানে পদ্যের পদবিন্যাস কবিতার দৃশ্যমান বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল।[10] সকল সাহিত্য মাধ্যমের প্রাচীনতম ও কঠিনতম মাধ্যম হল কবিতা বা পদ্য।[11]

গদ্য- গদ্য হল ভাষার একটি রূপ, যা সাধারণ পদবিন্যাস ও স্বাভাবিক বক্তৃতার ছন্দে লেখা হয়।[12] উক্ত সংগার আলোকে গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে। যেমনঃ প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, বক্তৃতা ইত্যাদি। নিচে সংক্ষেপে বিবরণ দেয়া হল-

প্রবন্ধ- একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। এটি কখনো সাধারণ বিশ্লেষণ ও বিবরণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় (সাধারণত পত্র-পত্রিকা ও বই ইত্যাদিতে লেখা হয়) আবার কখনো গবেষণার ও সূক্ষ্ম পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় (সাধারণত রিচার্স জার্নাল বা বিশেষ কোন প্রকল্প পরিকল্পনার ক্ষেত্রে লেখা হয়)।

গল্প- গল্পের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। যেমন:

বড়গল্প বা উপন্যাস- উপন্যাস হলো গদ্যে লেখা দীর্ঘাবয়ব বর্ণনামূলক কথাসাহিত্য। যিনি উপন্যাস রচনা করেন তিনি ঔপন্যাসিক। উপন্যাসও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমনঃ সামাজিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, রোমান্টিক উপন্যাস, ঐহিহাসিক উপন্যাস ইত্যাদি। অবশ্য সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্র তথা গদ্য, পদ্য, নাটক ইত্যাদি সবকিছুতেই উক্ত প্রকারভেদ প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

9 "কবিতা, ন.", অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান। http://www.oed.com/view/Entry/146552।
10 Preminger & Brogan 1993, পৃ. 938–9।
11 আল মামুন খান, ”ছোট গল্প নিয়ে কিছু কথা”, ১৩ ই মে, ২০১৬, http://www.somewhereinblog.net/blog/almamaunkhan/30133658
12 Preminger & Brogan 1993, পৃ. 938-9।

www.nagorikpathagar.org

উপন্যাসিকা- উপন্যাসিকা বা নোভেলা হলো ছোট গল্পের চেয়ে একটু বড় এবং উপন্যাসের চেয়ে ছোট।

ছোটগল্প- কোন ঘটনা সহজ সুন্দরভাবে গুছিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে সংক্ষিপ্ত চরিত্র নিয়ে উপস্থাপন করাটাই হল ছোট গল্প।[13]

ছোটগল্প ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ' সোনারতরী' কাব্যের যে ' বর্ষাযাপন' কবিতাটি প্রায়শই উদ্ধৃত হয়ে থাকে-

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা

নিতান্ত সহজ সরল,

সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি

তারি দু-চারটি অশ্রু জল।

নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,

নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে

শেষ হয়ে হইল না শেষ।[14]

নাটক- নাটক হল এমন এক ধরনের সাহিত্য যার মূল উদ্দেশ্য হল- উপস্থাপন বা পরিবেশন করা।[15] সাহিত্যের এই ধারায় প্রায়ই সঙ্গীত ও নৃত্যও যুক্ত হয়, যেমন গীতিনাট্য ও গীতিমঞ্চ।

চিঠিপত্র- যোগাযোগের জন্য চিঠিপত্রের আদান প্রদান বহুল প্রচলিত একটি পদ্ধতি। এসব চিঠিতে বিভিন্ন সময়ে বিখ্যাত কিংবা অখ্যাত ব্যক্তির শৈল্পিক লেখনি পরবর্তীতে মূল্যবান সাহিত্য হিসাবে সংকলিত হয়েছে।

স্বাক্ষরসাহিত্য- প্রদেশের গভর্ণরগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখতেন, সেসব চিঠিপত্রের নিচে সীলমোহরের সাথে ছোট ছোট বাক্যের অর্থপূর্ণ উক্তি সমূহ আরবী সাহিত্যে স্বাক্ষরসাহিত্য হিসাবে পরিচিত।[16]

জীবনীসাহিত্য - জীবনের যাবতীয় তথ্যাবলী সংকলন জীবনী সাহিত্য হিসেবে পরিচিত।[17]

13 আর্বনীল ,"গল্প , উপন্যাস এবং উপন্যাসিকা কি?" ০৬ ই আগস্ট ২০১৫, http://www.somewhereinblog.net/blog/robi_21123/30059406।

14 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সোনার তরী/বর্ষাযাপন"।

15 Kier Elam , The Semiotics of Theatre and Drama, London and New York: Methuen, p. 98.

16 الأستاذ صلاح عبد الستار محمد الشهاوي ، "التوقيعات الأدبية فن إسلامي خالص"، مجلة الداعي الشهرية، العدد : 9-1، يوليو - سبتمبر 2013م.

17 هديل البكري، المصدر السابق.

৩. রাজনীতি

৩.১. রাজনীতির পরিচয়ঃ

রাজনীতির ইংরেজী প্রতিশব্দ politics এবং আরবী প্রতিশব্দ **السياسة** (সিয়াসাহ্) । রাজনীতি বা সিয়াসাহ্ এর শাব্দিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান মু'জামুল ওয়াসিতে বলা হয়েছে - **عملية الحكم ودراسة الحكم।** শাসন প্রক্রিয়া এবং ইহার অধ্যয়ন।

রাজনীতি বলতে বুঝায় রাষ্ট্র শাসন বা পরিচালনার নীতি।[18] রাজনীতি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কিছু ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কোন গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিবার, রাষ্ট্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যেকোন ধরণের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে রাজনীতির চর্চা হতে পারে।

রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি বলতে অবশ্য রাষ্ট্র সম্পর্কীয় নীতি বুঝায়। কিন্তু বহুল প্রচলিত শব্দ রাজনীতি দ্বারা আমরা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ বা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার আন্দোলন বুঝায়। এই অর্থে আমরা স্বাধীনতার আন্দোলন, স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলন ইত্যাদি কথা ব্যবহার করে থাকি। রাজনীতি শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে কেবল রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার দাবি নয়, রাষ্ট্র এবং সমাজের যে কোন সমস্যা সমাধানের আন্দোলন বুঝাতে পারে। এই অর্থে শ্রমীকের এবং কৃষকের বা অপরাপর শ্রেণীর আর্থিক অসুবিধাসমূহ দূরিকরণের আন্দোলনও রাজনীতির অংশ। এই কারণে রাজনীতি বলতে কোন নির্দিষ্টি নীতির বদলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষামূলক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বুঝায়। তাই রাজনীতির প্রধান বাহন হচ্ছে সংগঠিত দল।[19]

অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে রাজনীতি তথা পলিটিক্স এর পরিচয়ে বলা হয়েছে[20]

- the activities associated with the governance of a country or area, especially the debate between parties having power.
- activities aimed at improving someone's status or increasing power within an organization.

প্রসিদ্ধ অনলাইন আরবী বিশ্বকোষ আল মাওদুতে রাজনীতির সংগায় বলা হয়েছে[21]

لا يمكن وضع تعريف واحد للسياسة نظراً لتعدد مجالاتها، وتداخلها مع كافة مجالات الحياة، إلا أنها تحتوي على العديد من النقاط التي قد يجمع عليها الجميع، فهي مجموعة من الأنشطة التي تتعلق بالتأثير على إجراءات وسياسات الحكومات

18 রাজনীতি, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ত্রয়োদশ পুনমুদ্রণ, (ঢাকা:বা/এ, জানুয়ারি ২০১১)।
19 সরদান ফজুল করিম, দর্শন কোষ, (ঢাকা : প্যাপিরাস, জুলাই ২০০৬) , পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪।
20 পলিটিক্স, অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান।
21 فيروز هماش , "ما هي السياسة ؟", ٢٠١٧ يوليو, https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7.

www.nagorikpathagar.org

والسلطات، ومجموعة من الوظائف التي يتكلف بها جماعة منتخبة من عامة الشعب، كما أنها مجموعة من الآراء والأفكار التي يعتقدها الشخص اتجاه السلطات والحكومة.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল তাঁর ‘পলিটিকস’ বইয়ের এক জায়গায় বলেন, রাজনীতি হচ্ছে সামাজিক অস্তিত্বের পূর্ব শর্ত [Politics as the essence of social existence] . আসলে এরিস্টটল বোঝাচ্ছেন, আমরা যখন দুই বা ততোধিক সম্পর্কে জড়িয়ে যাই বস্তুত তখনই আমরা একটি রাজনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে যাই। এই রাজনৈতিক সম্পর্কটাই প্রাকৃতিক কেননা, এরিস্টটল বলেন, (১)মানুষ সবসময়ই সমাজে নিজের একটা অবস্থান তৈরি করতে চায় (২) নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায় এবং তার জন্য সমাজের স্বল্প সম্পদের সঠিক বণ্টনের অংশ চায় (৩)ব্যক্তি অন্যকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে সদা সচেষ্ট।

একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখবো, এরিস্টটলের এই তিনটা যুক্তির মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের রাজনৈতিক প্রাণী হয়ে ওঠার কারন। যে কারনে তাকে বলতেই হয়, All people are politicians,but some are more political than others.

আমরা এখন বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির রাজনীতির সংজ্ঞা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। ঐতিহ্যবাদী রাষ্ট্রচিন্তকেরা সাধারনত রাজনীতিকে রাষ্ট্র সরকার ও আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রেখেছেন।এ চিন্তার অনুসারীদের মতে, রাজনীতি অপরিহার্যরূপে রাষ্ট্র নামক বাস্তবতার চতুর্দিকে ঘোরে। এ চিন্তাধারার ইতিহাসই দীর্ঘ; প্লেটো থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তক হ্যারল্ড লাস্কি, সকলেই এই ঐতিহ্যবাদী আদর্শমূলক(Normative) রাজনীতিতে আবর্তন করেছেন। প্লেটো বলেন, 'রাজনীতি হচ্ছে আত্মার পরিচর্যার কৌশল’ আর তাই রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনেতার (philosopher-King) দায়িত্ব হচ্ছে রাজনীতির মাধ্যমে তাঁর রাষ্ট্রের নাগরিকের মধ্যে নৈতিক গুণাবলির প্রসার ঘটানো। অন্যদিকে সেন্ট টমাস একুইনাসও রাজনীতিকে নৈতিক দিক হিসেবে কাজে লাগানোর কথা বলেন। তিনি বলেন রাজনীতির লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রে এমন একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করা যেখানে সবাই একসাথে মিলে নৈতিক ও সৎ পথে জীবন-যাপন করতে পারে।[Politics means to unify different parts of community for which a community is gathered is to live a virtuous life]. রাজনীতির এই কল্যাণমূলক ধারণা অবশ্য পরিবর্তন হলো আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক ম্যাকিয়াভেলির হাতে। তিনি বললেন, রাজনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রনেতার উদ্দেশ্যেকে বাস্তবায়িত করার পন্থা, এজন্য যদি তাকে অসৎ পন্থা দিয়েও যেতে হয় তবুও করার কিছু নাই। শক্তির রাজনীতির এই ধারা অনুসরন করেই হবস বললেন, রাজনীতি হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধান। [politics is the pursuit of peace and security]

তবে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতির খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা সংজ্ঞা দেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার। তিনি বলেন, রাজনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অথবা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ক্ষমতার অংশ লাভের চেষ্টা অথবা ক্ষমতার বিতরণকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা। ওয়েবারের সংজ্ঞায় এই গোষ্ঠীর (group) প্রতি গুরুত্ব দানই তৈরি করলো রাষ্ট্র বিমুখ রাজনীতির পথ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এবার আদর্শবাদী ধারা থেকে মুখ ফেরালেন অভিজ্ঞতাবাদের দিকে অর্থাৎ রাজনীতির Empirical পাঠের দিকে। আর্থার বেন্টলি ঘোষণা করলেন, রাজনীতির কাঁচামাল রাষ্ট্র থেকে উৎসারিত হয় না, বরং সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের কার্যাবলি ও সম্পর্কসমূহই এদের যোগান দেয়।আর গ্রাহাম

ওয়ালেস রাজনীতিকে পাঠ করলেন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে।তিনি বললেন, মানবীয় আচরনের জটিল জালের মধ্যেই রাজনীতির আবর্তন।

প্রখ্যাত আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাসওয়েলের মতে, রাজনীতি হচ্ছে প্রভাব ও প্রভাবশালীদের পাঠ। আরেকজন প্রখ্যাত আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হচ্ছেন ডেভিড ইস্টন।তিনি তার সিস্টেম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই তৈরি করেন তাঁর রাজনীতির সংজ্ঞা। তিনি বলেন, রাজনীতি হলো এক ধরনের কর্মকাণ্ড, যা একটি সমাজের জন্য সুবিধাসমূহের কর্তৃত্ববাদী বরাদ্দের সাথে জড়িত। ইস্টনের এই সংজ্ঞাটাকে আরো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্য করেছেন উইলিয়াম ভূলম। তিনি বলেন, রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা ব্যবহারের সাথে জড়িত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সহযোগিতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা একটি গোষ্ঠীর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

রাজনীতির এরূপ সংজ্ঞায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাজনীতিকে সমাজের প্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা। যেমন ডেভিড ট্রুম্যান বলেন, রাজনীতি হলো সমাজের স্বার্থগোষ্ঠীসমূহের কার্যাবলি এবং তাদের ভেতরকার দ্বন্দ্বসমূহের সামঞ্জস্য বিধায়ক প্রক্রিয়া।

তবে আচরণবাদী রাজনীতির সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন করেন মেয়ারসন ও ব্যানফিল্ড তাদের Politics,Planning and the public interest বইতে। তাদের মতে, রাজনীতি হচ্ছে একটি কর্মকাণ্ড(চুক্তির পূর্বে আলোচনা, যুক্তিতর্ক, মিটিং, মিছিল, শক্তি প্রয়োগ, প্ররোচনা, প্রোপাগাণ্ডা প্রভৃতি) যা দিয়ে একটি ইস্যুর উপর আন্দোলন হয় এবং তার নিস্পত্তি হয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা আমাদের কোটা বিরোধী আন্দোলনের কথা বলতে পারি যা খুব সহজভাবেই এই সংজ্ঞার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

রাজনীতির ধারণা কখনো স্থবির নয় বরং অত্যন্ত গতিশীল, এখানে কোন সুনির্দিষ্ট মতানৈক্য নাই। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট বিষয় অবশ্যই রাজনীতির মূল মাথাব্যথার কারণ। যেমন ওয়েবার বলেন বল প্রয়োগই রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অন্যদিকে আচরনবাদীদের প্রেক্ষিতে, সামাজিক বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্ব নিরসনেই রাজনীতির প্রধান দায়িত্ব।

এই বিষয়গুলো মাথায় থাকলেই বোঝা যাবে রাজনীতির উৎপত্তি তখনই হয় যখন তৈরি হয় ভিন্নমত, পণ্যের বণ্টনে সমস্যা, প্রশ্ন চলে আসে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে, চেষ্টা করা হয় কোন সুবিধা আদায়ের কিংবা মীমাংসার চেষ্টা করা হয় সমাজ থেকে সৃষ্ট কোন দ্বন্দ্বের।যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে রাজনীতি ব্যাখ্যা করতে চাওয়া হয় তখনই আসলে বোঝা যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নে কেন সমাজবিজ্ঞান বা অর্থনীতিসহ সামাজিক বিজ্ঞানের আরো অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার দিকে হাত বাড়াতে হয়।[22] মাও সেতুং বলেন বলেনরাজনীতি হল রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হল রক্তপাতময় রাজনীতি।

৩.২. রাজনৈতিক দর্শন বা রাষ্ট্রদর্শন

রাজনৈতিক হচ্ছে রাষ্ট্র সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তন, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, কার্যাবলি, মূল্য, রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতার সত্যতা, জীবন ও জগতের পরম সার্থকতা হিসেবে রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতার যথার্থতা সম্পর্কে দার্শনিক অনুসন্ধান লাভ। রাষ্ট্রদর্শন

[22] রানা সরকার, "রাজনীতি কি?", ১৮ই এপ্রিল ২০১৮, https://policoholic.wordpress.com/2018/04/18।

বলতে আমরা রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, পরিধি ও কার্যাবলি এবং মানব জাতির উন্নয়ন ও প্রগতি সম্পর্কিত মতবাদকে বুঝি। সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তাভাবনাই হলো রাষ্ট্রদর্শন। রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়বস্তু প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যেমন, মানব প্রকৃতি ও তার কার্যকলাপ, জীবনের সমগ্র অনুভূতির জন্য পৃথিবীর অপরাপর বিষয়ের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক।

রাষ্ট্রই হচ্ছে রাষ্ট্রদর্শনের মূল একথা বলা যায় না। বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রদর্শনের বিভিন্ন সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচীনকালে বিশেষ করে গ্রিক ও রোমান চিন্তায় যে সমস্ত প্রশ্ন প্রাধান্য পেয়েছে তার মধ্যে উল্লে¬খযোগ্য হলো ন্যায়নীতির ধারণা, আদর্শ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, শাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, শাসকের যোগ্যতা এবং আইনের প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য, সমতার ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব কী না প্রভৃতি।

মধ্য যুগে রাষ্ট্রদর্শনের ধারাটি ছিলো কিছুটা ভিন্ন ধর্মী। আধ্যাত্মিক ও পার্থিব শক্তির প্রাধান্যের লড়াই এই যুগের রাষ্ট্রদর্শনকে প্রভাবিত করেছে। ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন ষোড়শ শতাব্দীতে রাষ্ট্রদর্শনের অগ্রগতিকে প্রসারিত করেছে। সার্বভৌমিকতা ও জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণাটিও এই সময় প্রচারিত হয়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তায় প্রাধান্য পায় রাষ্ট্র ও সংগঠনের বিভিন্ন তত্ত্ব। গণতন্ত্র, প্রতিনিধিত্ব, সমতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি ধারণা এই সময় জনপ্রিয় হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যে বিষয়গুলো ছিলো রাজনৈতিক বিতর্কের মূলে তার মধ্যে উল্লে¬খযোগ্য হলো রাষ্ট্রের কার্যাবলি, পরিধি, রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি।[23]

৩.৩. রাজনীতির সীমা-পরিসীমা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের সময় আমাদের আরো অনেকগুলো বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়; যেমন অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, লোকপ্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এমনকি সাহিত্য পর্যন্ত। কেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্র এবং সরকারের কার্যাবলি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না? কেন তার হাত বিস্তার করতে হয় অর্থনীতির দিকে কিংবা সমাজের দিকে?

এই প্রশ্নের উত্তর এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়, রাজনীতিই এর প্রধান কারণ। কেননা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনীতির দ্বারা। সহজভাবে বলতে গেলে রাজনীতিবিজ্ঞান ই হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। আর এই রাজনীতির প্রভাবে বাধ্য হয়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তার শাখা বিস্তৃত করতে হয় বিভিন্ন দিকে। কেননা রাজনীতির বিস্তার সর্বস্তরে; অর্থনীতিতে যেমন কঠিন রাজনীতি কাজ করে তেমনি ইতিহাসও নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনীতির দ্বারাই । এমন কোন সমাজই পাওয়া সম্ভব নয় যেখানে রাজনীতি কাজ করে না; এমনকি সাহিত্যও রাজনীতি নিরপেক্ষ নয় মোটেই। রাজনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যেন তার নিজের কূল-কিনারাই খুঁজে পাচ্ছেনা। এমনকি লৈঙ্গিক

[23] মো. আবদুল ওদুদ, "রাষ্ট্রদর্শন", দ্বিতীয় সংস্করণ, (ঢাকা: মনন পাবলিকেশন, এপ্রিল ২০১৪), পৃষ্ঠা ২৩, ২৯।

www.nagorikpathagar.org

রাজনীতি (gender politics) বা আত্ম-পরিচয়ের রাজনীতি (identity politics)-ও আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।24

অর্থাৎ মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজনীতির পদাচারণা রয়েছে। মানুষের চিন্তা চেতনা, ধ্যান-ধারণা, রুচিবোধ, অভ্যাস, আচার-আচরণ, মানসিক অবস্থা সবকিছুই রাজনীতির উপর নির্ভর করে। মানুষের অস্তিত্ব যেখানে রাজনীতির অস্তিত্বও সেখানে বিদ্যমান।

৩.৪. ভূ- রাজনীতি

যেহেতু আরবী সাহিত্য ও আরব রাজনীতির মধ্যে তুলনামূলক আলোকপাত করা হচ্ছে সেহেতু সকলভাষার সাহিত্য ও পৃথিবীর পুরো ভূখণ্ডের রাজনীতির বিশ্লেষণ এখানে বিবেচ্য নয়। বিভিন্ন ভূ খণ্ডের রাজনীতি বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। একইভাবে বিভিন্ন ভূখণ্ডের সাহিত্য- সংস্কৃতির মধ্যেও রয়েছে ভিন্নতা। আলোচ্য বিষয়বস্তুকে সামনে এগিয়ে নিতে আরব ভূ খণ্ডের রাজনীতি ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবরণ আবশ্যক হওয়ায় ভূ খণ্ডভিত্তিক রাজনীতি তথা ভূ- রাজনীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল।

ভূ রাজনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Geo Politics । এটি এসেছে দুটি গ্রীক শব্দ Geo যার অর্থ ভূ এবং Politikos যার অর্থ রাষ্ট্র সম্পর্কিত। অতএব, ভূ রাজনীতি ভূগোল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান এ দুটি বিষয় কে সম্পর্কযুক্ত করে এবং এর মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তি ও ভৌগোলিক উপাদানের সমন্বয় সাধন করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলির সমাধানের চেষ্টায় রাজনৈতিক ভূগোলের সফল প্রয়োগকেই ভূ রাজনীতি বলা হয়।

অধ্যাপক আব্দুল হাকিমের মতে, "ভূ রাজনীতি হচ্ছে ভূগোলের সেই অংশ যা পররাষ্ট্রনীতি এবং রাজনৈতিক প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে।"

N.J.Spkysman বলেছেন, "ভৌগোলিক বাস্তবতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাজনিত নীতি প্রণয়ন করাকে ভূরাজনীতি বলে।”

সুতরাং ভূ রাজনীতি হচ্ছে ভূগোল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যৌথ শাখা, যা একটি জাতির শক্তির সামর্থ্য নির্ধারণ করে , জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং জাতির সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো দেশের ভূমিকা নির্ধারণ করে।25

এভাবে আরবের ভূ খণ্ড ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে তার রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়াবলীতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বৈশিষ্ট বিদ্যমান ছিল। ক্রমান্বয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইসলাম আবির্ভাবের পূর্ব সময় তথা জাহেলী যুগ থেকে সর্বশেষ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তুর্কি যুগের পতন পর্যন্ত আরবের রাজনৈতিক ইতিহাস উল্লেখ করা হল।

24 রানা সরকার," রাজনীতি কি?", ১৮ই এপ্রিল ২০১৮, https://policoholic.wordpress.com/2018/04/18।
25 ক্যাপ্টেন রেজাউল, "ভূ রাজনীতি বলতে কি বোঝায়?", 17 অক্টোবর 2017, https://www.bissoy.com/301344/।

www.nagorikpathagar.org

৩.৫. আরবের রাজনীতি (জাহেলি যুগ থেকে তুর্কি খেলাফতের শেষ পর্যন্ত)

ইসলাম পূর্ব তথা জাহেলি যুগ (৪৫০খ্রি. - ৬২২খ্রি.)

মানব জাতি সামাজিক জীবনের দিকে প্রথম যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা ছিল গোত্রীয় জীবন। গোত্র ছিল কতগুলো পরিবার ও আত্মীয়ের সমষ্টি যারা গোত্রের শেখ বা নেতার নেতৃত্বাধীনে জীবনযাপন করত। আর এভাবে গোত্রের মাধ্যমে সমাজের আদিমতম চিত্র বা রূপ অস্তিত্ব লাভ করে। সে সময়ের আরব জাতির জীবনযাত্রা এমনই ছিল। প্রতিটি গোত্র অন্য গোত্রের সাথে যোগ দিয়ে ছোট একটি সমাজ গঠন করত। গোত্রের সকল সদস্য গোত্রপতির আদেশ মেনে চলত। যে বিষয়টি তাদের পরস্পর সম্পর্কিত করে রেখেছিল তা ছিল তাদের গোত্রীয় বন্ধন ও আত্মীয়তা। এ সব গোত্র সব দিক থেকেই পরস্পর পৃথক ছিল; তাদের আচার-প্রথাও পৃথক ছিল। কারণ অন্য সকল গোত্র মূলত একে অপর থেকে আলাদা ও অপরিচিত বলে গণ্য হতো। প্রতিটি গোত্র অন্য গোত্রের কোন অধিকার ও সম্মান আছে-এ কথার স্বীকৃতি দিত না। প্রতিটি গোত্র অন্য গোত্রের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, সদস্যদের হত্যা এবং নারীদের অপহরণ করা তাদের আইনসংগত ন্যায্য অধিকার বলে গণ্য করত। তবে কোন গোত্রের সাথে যদি চুক্তি থাকত সে ক্ষেত্রে ছিল অন্যকথা। অন্যদিকে প্রতিটি গোত্র যখনই আগ্রাসন ও আক্রমণের শিকার হতো তখন সকল আগ্রাসনকারীকে হত্যা করা তাদের ন্যায্য অধিকার বলে গণ্য হতো। কারণ তারা বিশ্বাস করত যে, একমাত্র রক্ত ব্যতীত অন্য কিছু রক্তকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করতে সক্ষম নয়।

আরব জাতি ইসলাম ধর্ম কবুল করার মাধ্যমে গোত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পদার্পণ করে। মহানবী (সা.) বিক্ষিপ্ত আরব গোত্রগুলোকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে যে সব গোত্র সুদূর অতীতকাল থেকে পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আক্রমণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং একে অন্যের রক্ত ঝরাত তাদের অল্প সময়ের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করা সত্যি একটি বড় কাজ এবং একটি অতুলনীয় সামাজিক মুজিযা (অলৌকিক বিষয়) বলে গণ্য। কারণ এ ধরনের বিশাল পরিবর্তন যদি কতগুলো স্বাভাবিক পরিবর্তন ও রূপান্তরেরই ফল হতো তাহলে এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ এবং অগণিত মাধ্যম ও উপায়-উপকরণের প্রয়োজন হতো।[26]

টমাস কারলাইল বলেছেন, "মহান আল্লাহ্ ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে আরব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিচালিত করেছেন। সে জাতি স্থবির ছিল, যাদের ধ্বনি শোনা যেত না, যাদের কর্মতৎপরতা ও প্রাণচাঞ্চল্য অনুভূত হতো না তাদের থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব হয় যারা অখ্যাতি থেকে খ্যাতির দিকে, অলসতা ও শৈথিল্য থেকে জাগরণের দিকে, হীনতা ও দীনতা থেকে উচ্চ মর্যাদার পানে, দুর্বলতা ও অক্ষমতা থেকে শক্তি ও ক্ষমতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। তাদের থেকে আলো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর একশ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই মুসলিম উম্মাহ্ এক পা ভারতে ও অপর পা আন্দালুসিয়ায় (বর্তমান স্পেন) রাখতে সক্ষম হয়েছিল।"

পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেসিয়োর ন্যাঁ (مسيورنان) তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,

[26] মাহতাব উদ্দিন, "কেমন ছিল আইয়ামে জাহেলিয়াত?",বজ্রকণ্ঠ, Aug 16, 2018, https://bajroshakti.com।

এই বিস্ময়কর সুমহান ঘটনা (ইসলাম) যা আরব জাতিকে দিগ্বিজয়ী এবং উন্নত চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার উদ্ভাবকের পোশাকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে-তা ঘটার সময়কাল পর্যন্ত আরব উপদ্বীপের কোন অঞ্চলই না বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসের অংশ বলে গণ্য হতো, আর না বিজ্ঞান বা ধর্মের দৃষ্টিতে সেখানে সভ্যতার কোন নিদর্শন বিদ্যমান ছিল।

হ্যাঁ, জাহেলিয়াত যুগের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তগণ অর্থাৎ বিভিন্ন আরব গোত্র না কোন সভ্যতার আলো প্রত্যক্ষ করেছে, আর না তাদের কোন শিক্ষা-দীক্ষা, নিয়ম-কানুন ও আচার-প্রথার প্রচলন ছিল। যে সকল সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য উন্নতি ও সভ্যতা বিকাশের কারণ সেগুলো থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল। অতএব, কখনই আশা করা যেত না যে, এই জাতি এত অল্প সময়ের মধ্যে মর্যাদা ও সম্মানের শীর্ষে আরোহণ করবে এবং সংকীর্ণ গোত্রীয় জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে মানবতার সুবিস্তৃত জগতের পানে অগ্রসর হবে।

পৃথিবীর জাতিসমূহ আসলে ইমারতের মত। যেমনভাবে একটি মৌলিক ইমারত মজবুত উপাদানের মুখাপেক্ষী যা সঠিক পদ্ধতি অনুসারে এবং পূর্ণ শৃঙ্খলার সাথে নির্মিত হয়েছে যাতে করে তা ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টি-বাদলের প্রভাব থেকে টিকে থাকতে এবং স্থায়ী হতে পারে, ঠিক তেমনি একটি সাহসী ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জাতির গঠন-কাঠামো ও দৃঢ় ভিত্তিসমূহ অর্থাৎ মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, পূর্ণাঙ্গ রীতি-নীতি এবং উন্নত মানবীয় স্বভাব-চরিত্রের মুখাপেক্ষী যাতে তা অস্তিত্ব বজায় রাখতে ও প্রগতির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়।

হীরা ও গাসসান রাজ্যসমূহ

আরব উপদ্বীপের যে সব অঞ্চলের জলবায়ু ও আবহাওয়া ভালো ছিল সে সব অঞ্চল ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে সর্বশেষ শতাব্দীতে পুরোপুরি তিন বৃহৎ শক্তি অর্থাৎ ইরান, রোম ও আবিসিনিয়ার অধীন ছিল। আরব উপদ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ইরানের প্রভাবাধীন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রোমের অনুগত এবং মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল হাবাশাহ্ অর্থাৎ আবিসিনিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। এ সব সভ্য রাষ্ট্রের পাশে থাকার কারণে এবং ঐ সব রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বদা দ্বন্দ্ব থাকার কারণে আরব উপদ্বীপের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে অর্ধ-স্বাধীন ও অর্ধ-সভ্য বেশ কিছু রাজ্যের পত্তন হয়েছিল যেগুলোর প্রতিটিই ছিল নিজ নিজ প্রতিবেশী সভ্য বৃহৎ সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রের অনুগত। হীরা, গাসসান ও কিন্দাহ্ ছিল ঐ ধরনের রাজ্য যেগুলোর প্রতিটি ছিল পারস্য, রোম ও আবিসিনীয় সাম্রাজ্যের যে কোন একটির প্রভাবাধীন।

ঐতিহাসিক তথ্য ও বিবরণাদি অনুযায়ী খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমাংশে আশকানীয় যুগের শেষের দিকে কতিপয় আরব গোত্র ফোরাত নদীর পাড়ে অবস্থিত এলাকায় বসতি স্থাপন করে এবং ইরাকের একটি অংশকে নিজেদের কর্তৃত্বে নিয়ে আসে। তারা ধীরে ধীরে এ সব বসতি স্থাপনকারী আরব গ্রাম, দুর্গ, শহর ও নগর প্রতিষ্ঠা করে যেগুলোর মধ্যে ‘হীরা’ নগরটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ নগরীটি বর্তমান কুফা নগরীর নিকটেই অবস্থিত ছিল।

এ শহরটি ছিল দুর্গ-নগরী। আর এ বিষয়টি এ শহরের নামকরণ থেকেও স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে যায়। এ নগরীতে আরবগণ বসবাস করত। তবে ধীরে ধীরে তা শহরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ফোরাত অঞ্চলের ভালো জলবায়ু এবং প্রচুর নদ-নদীর অস্তিত্ব ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল হওয়ার কারণে অত্র অঞ্চল আবাদ হয়েছিল। ঐ অঞ্চলের

অধিবাসিগণ মরুবাসী আরব সর্দারদেরকে কৃষ্টি ও সভ্যতার আহবান জানাতে সক্ষম হয়েছিল। হীরা অঞ্চলের অধিবাসিগণ পারস্যের প্রতিবেশী হওয়ার কারণে পারস্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। খওরানাক প্রাসাদের ন্যায় হীরার সন্নিকটে বেশ কিছু প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল যা উক্ত নগরীকে এক বিশেষ সৌন্দর্য দান করেছিল। এ অঞ্চলের আরবগণ লিপি ও লিখনপ্রণালীর সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং সম্ভবত সেখান থেকেই লিপি ও লিখনপ্রণালী আরব উপদ্বীপের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত হয়েছিল।

হীরার শাসনকর্তা ও আমীরগণ বনি লাখম গোত্রের আরব ছিলেন এবং পারস্যের সাসানীয় সম্রাটগণ তাঁদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। হীরার আমীরদের সাসানীয় সম্রাটগণ এ কারণে সমর্থন করতেন যাতে করে তাঁরা তাঁদের (হীরার আমীরগণ) ইরান ও আরব বেদুইনদের মাঝে অন্তরায় হিসাবে গড়ে তুলতে এবং তাঁদের সহায়তায় পারস্য সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে লুণ্ঠনকারী আরব বেদুইন ও যাযাবরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। (হীরার) এ সব আমীরের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। হামযাহ্ ইসফাহানী এ সব আমীরের নাম ও আয়ুষ্কাল এবং যে সব সাসানীয় সম্রাট তাঁদের সমসাময়িক ছিলেন তাঁদের একটি তালিকা প্রদান করেছেন।

যা হোক বনি লাখম বংশের রাজ্য ছিল হীরা অঞ্চলের বৃহত্তম আরবীয় রাজ্য যা ছিল অর্ধসভ্য। এ বংশের সর্বশেষ বাদশাহ্ ছিলেন নূমান বিন মুনযির যিনি পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ কর্তৃক অপসারিত ও নিহত হয়েছিলেন। তাঁর অপসারণ ও হত্যার কাহিনী ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষে অথবা ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে একদল বহিরাগত আরব আরব উপদ্বীপের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে যা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী। এ দেশটি রোমান সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় ছিল এবং ঠিক যেমনি হীরার শাসকবর্গ পারস্য সম্রাটদের তাঁবেদার ছিল ঠিক তেমনি গাসসানীয় রাজ্যের শাসকবর্গও বাইজান্টাইনীয় সম্রাটদের তাঁবেদার ছিল।

গাসসান দেশটি কিছুটা সভ্য ছিল। যেহেতু দেশটির সরকারের কেন্দ্র একদিকে দামেস্কের কাছাকাছি, অন্যদিকে বসরার নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেহেতু এ দেশটি রোমান প্রভাবাধীন আরব অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। আর অত্র এলাকাতে রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গাসসানিগণ হীরার লাখম গোত্রভুক্ত শাসকবর্গ এবং ইরানীদের সাথে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব থাকার কারণে রোমান সাম্রাজ্যের মিত্র হয়েছিল। প্রায় ৯ অথবা ১০ গাসসানী আমীর একের পর এক এ দেশটিতে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে।[27]

হিজাযে জ্ঞান ও শিক্ষা

হিজাযের জনগণ ও অধিবাসীদের ‘উম্মী’ বলা হতো। ‘উম্মী’ শব্দের অর্থ অশিক্ষিত। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে উম্মী বলা হয় যে মায়ের পেট থেকে যে অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ঠিক সে অবস্থায়ই রয়েছে। (জাহেলিয়াতের যুগে) আরবদের

[27] মুহাম্মদ রেজা ই করীম, আরব জাতির ইতিহাস,চতুর্থ সংস্করণ, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী প্রেস, ২০০৮), পৃ. ৮-১৩।

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে হলে আমাদের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, ইসলামের শুভ অভ্যুদয়ের লগ্নে কুরাইশ গোত্রে কেবল ১৭ ব্যক্তি লেখাপড়া জানত। আর মদীনায় পড়াশোনা জানত কেবল ১১ জন।[28]

মুহাম্মদ (সা) এর আগমন ও ইসলামী যুগের সূচনা

শেষ নবী মহানবী মুহাম্মদ(সা) এর জন্মের মধ্য দিয়েই মূলত জাহেলী সমাজের সমাপ্তি শুরু হয়। সকল অন্ধকার দূরভিত করে গোটা পৃথিবীকে আলোকিত করতে তিনি এসেছিলেন এই ধরায়। তার জন্মের সাথে সাথে সকল মুর্খতা আর কুসংস্কারের পরাজয় শুরু হলেও ইহা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল তার জন্মের তেপ্পান্ন বছর পর তথা ৬২৩ খৃঃ মদীনার রাষ্ট্রপতি হওয়ার মাধ্যমে।

মুহাম্মাদ মদিনায় গিয়েছিলেন একজন মধ্যস্থতাকারী এবং শাসক হিসেবে। তখন বিবদমান দুটি মূল পক্ষ ছিল বনু আওস ও বনু খাজরাজ। তিনি তার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছিলেন। মদিনার সকল গোত্রকে নিয়ে ঐতিহাসিক মদিনা সনদ স্বাক্ষর করেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম সংবিধান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই সনদের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে সকল রক্তারক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এমনকি এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতির গোড়াপত্তন করা হয় এবং সকল গোত্রের মধ্যে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়। আওস, খাযরাজ উভয় গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এছাড়াও প্রধানত তিনটি ইহুদি গোত্র (বনু কাইনুকা, বনু কুরাইজা এবং বনু নাদির)। এগুলোসহ মোট আটটি গোত্র এই সনদে স্বাক্ষর করেছিল।[29] এই সনদের মাধ্যমে মদিনা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুহাম্মাদ হন তার প্রধান। যে সকল মদিনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুসলিম মুহাজিরদের আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেন তারা আনসার (সাহায্যকারী) নামে পরিচিত হন।[30]

মদিনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই মক্কার সাথে এর সম্পর্ক দিন দিন খারাপ হতে থাকে। মক্কার কুরাইশরা মদিনা রাষ্ট্রের ধ্বংসের জন্য যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করতে থাকে। মুহাম্মাদ মদিনায় এসে আশেপাশের সকল গোত্রের সাথে সন্ধি চুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা গৃহত্যাগী সকল মুসলিমদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়। এই অবস্থায় ৬২৪ সালে মুহাম্মাদ ৩০০ সৈন্যের একটি সেনাদলকে মক্কার একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠায়। কারণ উক্ত কাফেলা বাণিজ্যের নাম করে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছিল। কুরাইশরা তাদের কাফেলা রক্ষায় সফল হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যুদ্ধের ডাক দেয়। আত্মরক্ষামূলক এই যুদ্ধে মুসলিমরা সৈন্য সংখ্যার দিক দিয়ে কুরাইশদের এক তৃতীয়াংশ হয়েও বিজয় অর্জন করে। এই যুদ্ধ বদর যুদ্ধ নামে পরিচিত যা ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ মার্চ তারিখে সংঘটিত হয়।[31] মুসলিমদের মতে, এই যুদ্ধে আল্লাহ মুসলিমদের সহায়তা করেছিলেন। এরপর ৬২৫ সালের ২৩ মার্চে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে প্রথম দিকে কুরাইশরা পরাজিত হলেও শেষে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করতে সমর্থ হয় এবং মুসলিমগণ সূচনাপর্বে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও চূড়ান্ত মুহূর্তের নীতিগত দুর্বলতার কারণে পরাজিতের বেশে মদীনায় প্রবেশ করে। ৬২৭ সালে আবু সুফিয়ান কুরাইশদের আরেকটি দল নিয়ে মদিনা আক্রমণ করে। কিন্তু এবারও খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের কাছে

28 প্রাক ইসলামী যুগে আরবের অবস্থা, 2015-03-16, http://alhassanain.org।
29 Watt, The Cambridge History of Islam, p. 39.
30, Welch Buhl, "Muḥammad". Encyclopaedia of Islam 7 ,2nd ed., Brill Academic Publishers, p. 360–376.
31 Watt, previous source, p. 132-137.

পরাজিত হয়। যুদ্ধ বিজয়ে উৎসাহিত হয়ে মুসলিমরা আরবে একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়। ফলে আশেপাশের অনেক গোত্রের উপরই মুসলিমরা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।[32]

কিন্তু এ সময় মদিনার বসবাসকারী ইহুদিরা ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকী হয়ে দেখা দেয়। মূলত ইহুদিরা বিশ্বাস করত না যে, একজন অ-ইহুদি শেষ নবী হতে পারে। এজন্য তারা কখনই ইসলামের আদর্শ মেনে নেয় নি এবং যখন ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তি বুঝতে পারে তখন তারা এর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। মুহাম্মাদ প্রতিটি যুদ্ধের পরে একটি করে ইহুদি গোত্রের উপর আক্রমণ করেন। বদর ও উহুদের যুদ্ধের পর বনু কাইনুকা ও বনু নাদির গোত্র সপরিবারে মদিনা থেকে বিতাড়িত হয়; আর খন্দকের পর সকল ইহুদিকে মদিনা থেকে বিতাড়ন করা হয়।[33]

মক্কার কাফেরদের শত্রুতার কারণে মুসলিমরা হজ্জ আদায় করতে পারছিল না। মুহাম্মাদ (সা) স্বপ্নে দেখতে পান তিনি হজ্জের জন্য মাথা কামাচ্ছেন। এ দেখে তিনি হজ্জ করার জন্য মনস্থির করেন এবং ৬ হিজরি সনের শাওয়াল মাসে হজ্জের উদ্দেশ্যে ১৪০০ সাহাবা নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু এবারও কুরাইশরা বাধা দেয়। মুসলিমরা মক্কার উপকণ্ঠে হুদাইবিয়া নামক স্থানে ঘাটি স্থাপন করে। এখানে কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে সুপরিচিত। এই সন্ধি মতে মুসলিমরা সে বছর হজ্জ করা ছাড়াই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে। সন্ধির অধিকাংশ শর্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে গেলেও মুহাম্মাদ এই চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।[34]

মুহাম্মাদ (সা) সারা বিশ্বের রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং পৃথিবীর সব জায়গায় ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দেওয়া তাঁর দায়িত্ব ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রগুলো থেকে আশ্বস্ত হয়ে তিনি এ কাজে মনোনিবেশ করেন। সে সময়ে পৃথিবীর প্রধান রাজশক্তিগুলো ছিল ইউরোপের রোম সাম্রাজ্য, এশিয়ার পারস্য সাম্রাজ্য এবং আফ্রিকার হাবশা সাম্রাজ্য। এছাড়াও মিশরের আজিজ মুকাউকিস' , ইয়ামামার সর্দার এবং সিরিয়ার গাসসানী শাসনকর্তাও বেশ প্রতাপশালী ছিল। তাই ষষ্ঠ হিজরির জিলহজ মাসের শেষদিকে একইদিনে এদেঁর কাছে ইসলামের আহ্বানপত্রসহ ছয়জন দূত প্রেরণ করেন।[35]

দশ বছরমেয়াদি হুদাইবিয়ার সন্ধি মাত্র দু' বছর পরেই ভেঙ্গে যায়। খুজাআহ গোত্র ছিল মুসলমানদের মিত্র, অপরদিকে তাদের শত্রু বকর গোত্র ছিল কুরাইশদের মিত্র। একরাতে বকর গোত্র খুজাআদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। কুরাইশরা এই আক্রমণে অন্যায়ভাবে বকর গোত্রকে অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করে। কোনো কোনো বর্ণনামতে কুরাইশদের কিছু যুবকও এই হামলায় অংশগ্রহণ করে। এই ঘটনার পর মুহাম্মাদ কুরাইশদের কাছে তিনটি শর্তসহ পত্র প্রেরণ করেন এবং কুরাইশদেরকে এই তিনটি শর্তের যে কোনো একটি মেনে নিতে বলেন। শর্ত তিনটি হলোঃ কুরাইশ খুজাআ গোত্রের নিহতদের রক্তপণ শোধ করবে। অথবা তারা বকর গোত্রের সাথে তাদের মৈত্রীচুক্তি বাতিল ঘোষণা করবে। অথবা এ ঘোষণা দিবে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল করা হয়েছে এবং কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য

32 Watt, previous source, p. 35.
33 John L Esposito, *The* Oxford Dictionary of Islam, ed. 2003, p.10-11.
34 Watt, al- Hudaybiya or al-Hudaybiyya Encyclopedia of Islam.
35 An Introduction to the Quran II (1895), p.273.

প্রস্তুত। কুরাইশরা জানালো যে, তারা শুধু তৃতীয় শর্তটি গ্রহণ করবে। কিন্তু খুব দ্রুত কুরাইশ তাদের ভুল বুঝতে পারলো এবং আবু সুফিয়ানকে সন্ধি নবায়নের জন্য দূত হিসেবে মদিনায় প্রেরণ করলো। কিন্তু মুহাম্মাদ কুরাইশদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করলেন।[36]

৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ দশ হাজার সাহাবীর বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন।সেদিন ছিল অষ্টম হিজরির রমজান মাসের দশ তারিখ। বিক্ষিপ্ত কিছু সংঘর্ষ ছাড়া মোটামুটি বিনাপ্রতিরোধে মক্কা বিজিত হলো এবং মুহাম্মাদ বিজয়ীবেশে সেখানে প্রবেশ করলেন। তিনি মক্কাবাসীর জন্য সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিলেন। তবে দশজন নর এবং নারী এই ক্ষমার বাইরে ছিল। তারা বিভিন্নভাবে ইসলাম ও মুহাম্মাদ এর কুৎসা রটাত।[৮২] তবে এদের মধ্য হতেও পরবর্তীতে কয়েকজনকে ক্ষমা করা হয়। মক্কায় প্রবেশ করেই মুহাম্মাদ সর্বপ্রথম কাবাঘরে আগমন করেন এবং সেখানকার সকল মূর্তি ধ্বংস করেন।[37] মুসলমানদের শান-শওকত দেখে এবং মুহাম্মাদ এর ক্ষমাগুণে মুগ্ধ হয়ে অধিকাংশ মক্কাবাসীই ইসলাম গ্রহণ করে।

সবশেষে ৬৩২ খৃষ্টাব্দ সালে বিদায় হজ্জের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে ইসলামের পরিপূর্ণতা লাভ করেন। বিদায় হজ্জের কিছুকাল পর ৮ই জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে রবিবারে বা ১১ হিজরি সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মদ(সা) এর মৃত্যুর পরবর্তি তিরিশ বছরকে ইসলামের ইতিহাসে বলা হয় খেলাফতে রাশেদা।

আরবি الخلافة الراشدية/ খেলাফতে রাশেদা (সময়কালঃ ৬৩২ - ৬৬১) বলতে ইসলামের প্রথম চার খলিফার শাসনকালকে বুঝানো হয়। ৬৩২ সালে নবী মুহাম্মদ-এর মৃত্যুর পর এই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হওয়ার পর এটি সমগ্র আরব উপদ্বীপ, লেভান্ট থেকে উত্তর ককেসাস, পশ্চিমে মিসর থেকে বর্তমান তিউনিসিয়া ও পূর্বে ইরানীয় মালভূমি থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৬৩২ সালে মুহাম্মদ (সা) এর মৃত্যুর পর তার দুই সাহাবি আবু বকর ও উমর সাকিফা বনি সাদায় তার উত্তরসুরি নির্বাচনের জন্য আলোচনায় বসেন। এসময় তার পরিবার তার দাফনের কাজে নিয়োজিত ছিল। খলিফা কে হবে তা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। আনসাররা নবীর সাহায্যকারী হিসেবে বিবেচনা করে সা' দ ইবনে উবাদাহ আল-আনসারীকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করে। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করা মুহাজির এবং মদিনার আনসারদের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ তৈরী হয়। শেষ পর্যন্ত আবু বকর খলিফা হিসেবে মনোনীত হন। এর মাধ্যমে খিলাফত নামক নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্টান গড়ে উঠে। আবু বকরের ক্ষমতালাভের পর খুব দ্রুত সমস্যা মাথাচাড়া দেয় এবং তা রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে উঠে। মুহাম্মদ (সা) এর জীবদ্দশাতেই কিছু ধর্মদ্রোহিতার ঘটনা ঘটে এবং এ সংক্রান্ত সর্বপ্রথম সংঘর্ষ তার জীবদ্দশাতেই হয়।

প্রথম বড় ধরনের ধর্মদ্রোহিতার ঘটনা ঘটে ইয়েমেনে। এটি আসওয়াদ আল আনসির ঘটনা বলে পরিচিত। ইয়েমেনের পারস্য বংশোদ্ভূত মুসলিম গভর্নর ফিরোজ তাকে হত্যা করেন। তার হত্যার ঘটনা মুহাম্মদ (সা) এর

[36] *Majid Ali Khan, Muhammad the final messenger, 2nd ed., (India: Islamic Book Service, 1998), p. 274-275.*
[37] An Introduction to the Quran II (1895), p.274.

মৃত্যুর কিছু পর মদিনায় পৌছে। ইসলাম গ্রহণকারী অধিকাংশ গোত্রই হিজরতের নবম বা দশম সালে ইসলামে আসে।

ধর্মত্যাগের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তা আরবের প্রত্যেকটি গোত্রকে প্রভাবিত করে। মক্কা, মদিনা, তাইফের সাকিফ গোত্র ও ওমানের আজদ গোত্র এর বাইরে ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরো গোত্র ধর্মত্যাগ করে। কিছু ক্ষেত্রে ইসলামকে অস্বীকার না করলেও জাকাত দিতে অস্বীকারের ঘটনা ঘটে। অনেক গোত্রীয় নেতা নিজেকে নবী দাবি করা শুরু করে। গোত্রগুলো দাবি করে যে তারা মুহাম্মদ (সা) এর কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছিল এবং তার মৃত্যুর পর এটি কার্যকর হবে না। আবু বকর আপত্তি করে বলেন যে তারা রাসুলের প্রতি না বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি এসময় মুসলিমদের খলিফা ছিলেন। ধর্মত্যাগ ইসলামি আইনে সর্বোচ্চ ধরনের অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। আবু বকর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

এর মাধ্যমে রিদ্দার যুদ্ধ শুরু হয়। মধ্য আরবের ধর্মত্যাগীদের নেতৃত্ব ছিল স্বঘোষিত নবি মুসায়লামা। অন্যরা দক্ষিণ ও পূর্বের অন্যান্য অঞ্চল যেমন বাহরাইন, মাহরা ও ইয়েমেনে নেতৃত্বে দিচ্ছিল। আবু বকর বিদ্রোহ দমনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রাথমিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। বিদ্রোহীদের শক্তিশালী বাহিনীগুলোর সাথে লড়াইয়ের জন্য খালিদের সেনাদের ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য সেনাদলগুলো তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহীদের মোকাবেলায় ব্যবহার করা হত। আবু বকরের পরিকল্পনা ছিল প্রথমে পশ্চিম ও মধ্য আরব (যা মদিনার নিকটবর্তী ছিল) নিষ্কন্টক করা, এরপর মালিক ইবনে নুয়ায়রাহকে মোকাবেলা করা ও শেষে সবচেয়ে বিপদজনক শত্রু মুসায়লামাকে শায়েস্তা করা। বেশ কিছু ধারাবাহিক সাফল্যের পর খালিদ বিন ওয়ালিদ শেষপর্যন্ত ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামাকে পরাজিত করেন। হিজরি ১১ সালে এ যুদ্ধ শুরু ও সমাপ্ত হয়। ১২ হিজরিতে আরব মদিনায় অবস্থান করা খলিফার নেতৃত্ব একীভূত হয়। বিদ্রোহী নবীদের যুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে আবু বকর আরবকে ইসলামের অধীনে সুসংহত করেন এবং ইসলামি রাষ্ট্রকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেন।

বিদ্রোহ দমনের পর আবু বকর বিজয় অভিযান শুরু করেন। এ বিজয় অভিযানের মাধ্যমে কয়েক দশকের মধ্যে বিশ্বের একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য জন্ম নেয়। আবু বকর সাসানীয় প্রদেশের মধ্য সবচেয়ে ধনী ইরাক দিয়ে শুরু করেন। ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার সবচেয়ে রণকুশলী সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে সাসানীয় সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। রোমান সিরিয়া আক্রমণের জন্য তিনি চারটি সেনাদল পাঠান, কিন্তু চূড়ান্ত অপারেশন ইরাক জয়ের পর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খালিদকে সিরিয়ান ফ্রন্টে বদলি করার পর তার অধীনেই সম্পন্ন হয়।[৩৪]

আবু বকর সামরিক ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে উমরের গুরুত্ব দিতেন এবং তাকে তার উত্তরসুরি মনোনীত করে যান। তিনি তার মনোনয়নের কথা জানিয়ে যান এবং উমর তার মৃত্যুর পর খলিফার দায়িত্ব লাভ করেন। পূর্বসূরির শুরু করা বিজয় অভিযান উমর চালিয়ে যান। তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের আরো ভেতরে, উত্তরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অঞ্চলগুলোতে এবং পশ্চিমে মিশরে অভিযান পরিচালনা করেন। উমর সেনাপতি হিসেবে কোনো যুদ্ধে অংশ নেননি। তবে তিনি অভিযান অব্যাহত রাখার ও ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখেন।

[৩৪] মুহাম্মদ রেজা ই করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৭৯।

এসব অঞ্চল শক্তিশালী সাম্রাজ্য কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত কিন্তু বাইজেন্টাইন ও সাসানীয়দের মধ্যকার দীর্ঘকালব্যপী চলা সামরিক সংঘর্ষের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ায় মুসলিমরা সহজে তাদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। ৬৪০ নাগাদ মুসলিমরা মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অধিকার করে নেয়; ৬৪২ নাগাদ মিশর, এবং ৬৪৩ নাগাদ সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য অধিকারে চলে আসে।

খিলাফত তার সীমানা বৃদ্ধির সময় উমর এর জন্য রাজনৈতিক কাঠামো দাড় করাতে শুরু করেন। সরকারি কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য তিনি একটি দিওয়ান সৃষ্টি করেন। সামরিক বাহিনীকে সরাসরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও খরচের আওতায় আনা হয়। অধিকৃত ভূখন্ডে তিনি অমুসলিমদের ইসলামে আসতে বাধ্য করেননি এবং পারসিয়ানদের মত সরকারকে কেন্দ্রীভূতও করেননি। তিনি তার প্রজাদের নিজস্ব ধর্ম, ভাষা ও প্রথা ধরে রাখার অনুমতি দেন এবং তাদের নিজস্ব শাসন বজায় রাখার সুযোগ দেন। তবে তাদের উপর একজন গভর্নর (আমির) ও একজন অর্থনৈতিক কর্মকর্তা (আমিল) থাকতেন। বিজয়ের ফলে অর্জিত সম্পদ উমর জাগতিক কাজে ব্যবহার করতেন। সাহাবিদেরকে পেনশন দেয়া হত। তারা ধর্মীয় অধ্যয়নে নিয়োজিত হতেন এবং নিজ নিজ লোকেদের মধ্যে নেতৃত্ব দিতেন। উমরকে ইসলামি বর্ষপঞ্জি "হিজরি সন" প্রণয়নের জন্য স্মরণ করা হয়। মুহাম্মদ (সা) এর হিজরতের বছরকে স্মরণ করে এটি ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু ধরা হয়। ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে উমর ফজরের নামাজের সময় একজন পারসিয়ান দাস পিরুজ নাহাওয়ান্দির (আরবরা তাকে আবু লুলু বলে ডাকত) ছুরিকাঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন।[39]

উমরের মৃত্যুর পূর্বে তিনি পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয়জন সদস্যের একটি কমিটি নিয়োগ দেন এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা হিসেবে বেছে নিতে বলেন। কমিটির সদস্যরা উমরের মত কুরাইশ বংশের সদস্য ছিলেন। এখান থেকে হযরত উসমান(রা) খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হোন। উসমান বার বছর খলিফা হিসেবে শাসন করেন। শাসনের প্রথম অর্ধেক বছর তিনি সহজে শাসন পরিচালনা করলেও পরের বছরগুলো পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়ে। মিশরীয়রা বিরোধিতা শুরু করে এবং আলির প্রতি নিজেদের দৃষ্টিনিবন্ধ করে।

আভ্যন্তরীন সমস্যা সত্ত্বেও উসমান উমরের বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। রাশিদুন সেনাবাহিনী বাইজেন্টাইনদের কাছ থেকে উত্তর আফ্রিকা জয় করে এবং এমনকি স্পেন আক্রমণ করে ইবেরিয়ান উপদ্বীপের উপকূল জয় করে। তারা রোডস ও সাইপ্রাস আক্রমণ করে। ৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে সিসিলি উপকূল আক্রমণ করা হয়।[১০] রাশিদুন সেনারা সম্পূর্ণ সাসানীয় সাম্রাজ্য জয় করে এবং পূর্ব সীমান্ত সিন্ধু নদ পর্যন্ত পৌছায়। কুরআনের প্রমিত পাঠের উপর উসমানের অবদান তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়।

শাসনকালের এক পর্যায়ে পরিকল্পিতভাবে অনুপ্রবেশকারী কিছু মুনাফিক হযরত উসমান (রা) এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার ছড়াতে থাকেন। তন্মধ্যে কোরআন পুড়ানো, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি অভিযোগ অন্যতম ছিল। ধীরে ধীরে অপপ্রচার থেকে প্রতিবাদ শুরু হয়। হজ্জের মৌসুমকে কাজে লাগিয়ে মুনাফিকরা প্রতিবাদকে অবরোধে রূপ দেয়। হযরত উসমান গৃহযুদ্ধ এড়ানর জন্য কোনো সামরিক পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকেন এবং আলোচনায় আগ্রহ

[39] মুহাম্মদ রেজা ই করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০- ৯৬।

দেখান। বিদ্রোহীদের প্রতি তার নম্র ব্যবহার তাদের সাহস বাড়িয়ে দেয় এবং তারা জোরপূর্বক তার বাড়িতে ঢুকে কুরআন তিলাওয়াত করা অবস্থায় তাকে হত্যা করে (সময়কাল- ৬৫৬খ্রি.)।[40]

তৃতীয় খলিফা উসমানের হত্যাকান্ডের পর মদিনার সাহাবিরা আলিকে খলিফা মনোনীত করেন। আলি কয়েকজন প্রাদেশিক গভর্নরকে পদচ্যুত করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উসমানের আত্মীয় ছিল। তাদের স্থলে মালিক আল আশতার ও সালমান ফারসির মত আস্থাভাজনদের নিয়োগ দেন। এরপর আলি তার রাজধানী মদিনা থেকে সরিয়ে বর্তমান ইরাকে অবস্থিত মুসলিম গেরিসন শহর কুফায় নিয়ে যান।

জনগণের মধ্য থেকে উসমান হত্যার বিচারের জন্য দাবি উঠতে থাকে। যুবাইর ইবনুল আওয়াম, তালহা ইবন উবাইদিল্লাহ ও মুহাম্মদ (সা) এর বিধবা স্ত্রী আয়েশা বিনতে আবু বকরের অধীনে একটি বড় আকারের সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে যায়। সেনারা বসরা পৌছে এটি অধিকার করে এবং প্রায় ৪০০০ সন্দেহভাজন রাষ্ট্রদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। এরপর আলি বসরার দিকে এগিয়ে যান এবং খলিফার সেনাবাহিনী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়। আলি বা তালহা ও যুবায়ের কেউ লড়াইয়ে আগ্রহী ছিলেন না তবুও রাতের বেলা দুই বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। যে বিদ্রোহীরা উসমানকে হত্যা করেছিল তারাই রাতে গোপনে লড়াই শুরু করে কারণ তারা আলি ও বিরোধী সেনাদের আলোচনার কারণে ধরা পড়ার ভয়ে ছিল। এটি ইতিহাসে মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ এবং এটি উটের যুদ্ধ বলে পরিচিত। আলির অধীন বাহিনী বিজয়ী হয় এবং বিরোধ মিটিয়ে ফেলা হয়। মুহাম্মদ (সা) এর ঘনিষ্ঠ সাহাবি তালহা ও যুবায়ের যুদ্ধে নিহত হন। আয়েশাকে মদিনায় পাঠানোর জন্য আলি তার পুত্র হাসান ইবনে আলিকে প্রেরণ করেন।

এ ঘটনার পর উসমানের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আবার গুঞ্জন উঠে। এবার উসমানের আত্মীয় মুয়াবিয়া এ দাবি তোলেন। তিনি সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ হয়। কিন্তু বিরোধ মীমাংসার জন্য নিযুক্ত আমর ইবনুল আস মুয়াবিয়ার প্রতি নিজের সমর্থন ব্যক্ত করায় তাকে হার মানতে হয়। এরপর আলি ও বিদ্রোহী খারিজিদের মধ্যে নাহরাওয়ানের যুদ্ধ হয়। তারা প্রথমে আলির সমর্থক থাকলেও সিফফিনের যুদ্ধের মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের অমত থাকায় আলি ও মুয়াবিয়া উভয়ের বিরুদ্ধে চলে যায়। এসময় সিসিলি, উত্তর আফ্রিকা, স্পেনের উপকূল অঞ্চল ও আনাতোলিয়ার কিছু দুর্গ অন্য সাম্রাজ্যের হস্তগত হয়।

৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে মুলজাম নামক ব্যক্তি আলিকে হত্যা করে। বিপক্ষের সকল নেতাকে হত্যা করার খারিজিদের পরিকল্পনামাফিক তাকে হত্যা করা হয়। তবে তারা মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আসকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়।

আলির (রা:) পুত্র ও মুহাম্মদ (সা) এর দৌহিত্র হাসান ইবনে আলি খিলাফতের জন্য মনোনীত হলেও খলীফা হতে পারেন নি। মুসলিমদের বিবদমান দুই দলের মধ্যে বিবাদ নিরসনের জন্য তিনি মুয়াবিয়ার সাথে চুক্তিতে আসেন। মুয়াবিয়া খিলাফতের দায়িত্ব পান এবং উমাইয়া খিলাফতের গোড়াপত্তন করেন। এর মাধ্যমে রাশিদুন খিলাফতের সমাপ্তি হয়।[41]

[40] মুহাম্মদ রেজা ই করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭- ১০৮।
[41] মুহাম্মদ রেজা ই করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯- ১২৩।

রাশিদুন খিলাফত ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত হয়। ২৪ বছরের মধ্যে এটি বিশাল সীমানার অধিকারী হয় যার মধ্যে উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ট্রান্সঅক্সানিয়া, ককেসাস, আনাতোলিয়ার অংশবিশেষ, সমগ্র সাসানীয় সাম্রাজ্য, বৃহত্তর খোরাসান, সাইপ্রাস, রোডস, সিসিলি, ইবেরিয়ান উপদ্বীপ আক্রমণ করা হয়, এবং বেলুচিস্তান জয় করা হয়। সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমানা ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধু নদ ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত পৌছায়। সাসানীয় সাম্রাজ্যে আক্রমণ করলে তারা আত্মসমর্পণ না করে লড়াই চালিয়ে যায় এবং হারানো এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালায়। মুসলিমরা পুরো সাসানীয় সাম্রাজ্য দখল করে নেয়। সমগ্র সাম্রাজ্য মুসলিমদের হাতে আসে। তবে সাসানীয়দের মত না হয়ে বাইজেন্টাইনরা সিরিয়া হারানোর পর পশ্চিম আনাতোলিয়ায় পিছু হটে। ফলে তারা মিশর, উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি দ্বীপপুঞ্জ, সাইপ্রাস, রোডস হাতছাড়া করে। তবে মুসলিমদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের ফলে বিজয় অভিযান স্থগিত হয় এবং এর ফলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নিজেকে সামলে নেয়ার সুযোগ পায়।

দারুল ইসলামের প্রশাসনিক ভিত্তি মুহাম্মদ (সা) এর সময়ে স্থাপিত হয়। আবু বকর খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম ভাষণে বলেন, "যদি আমি আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশের বাইরে কিছু আদেশ দিই তবে আমার আদেশ মানবে না।" একে খিলাফতের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। খলিফা উমর বলেন, "হে মুসলিমরা, যখন আমি ভুল কিছু করি তখন আমাকে তোমাদের হাত দিতে সোজা করে রাখ।" এর জবাবে মুসলিমরা দাঁড়িয়ে বলে, "হে আমিরুল মুমিনিন, যদি আপনি আমাদের হাতের মাধ্যমে সঠিক না হন তবে আমরা আমাদের তলোয়ার ব্যবহার করব।" একথা শুনে খলিফা উমর বলেন, "আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) যে আমার এমন অনুসারী রয়েছে।"[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উমর অন্য সবার চেয়ে দক্ষ ছিলেন। তার প্রশাসনিক দক্ষতার কারণে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] আবু বকরের সময় সাম্রাজ্য স্পষ্টভাবে প্রদেশে বিভক্ত ছিল না। তবে এখানে অনেক প্রশাসনিক জেলা ছিল। উমরের খিলাফতের সময় সাম্রাজ্যকে বেশ কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়। এগুলো হলঃ আরবকে মক্কা ও মদিনা এ দুই প্রদেশে ভাগ করা হয়। ইরাককে বসরা ও কুফা এ দুই প্রদেশে ভাগ করা হয়। জাজিরা প্রদেশ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উত্তর পর্যন্ত গঠন করা হয়। সিরিয়া নিজে একটা প্রদেশ ছিল। ফিলিস্তিনকে আয়লিয়া ও রামলাহ নামক প্রদেশে ভাগ করা হয়। মিশরকে উর্ধ্ব মিশর ও অধো মিশর নামক দুইটি প্রদেশে ভাগ করা হয়। পারস্যকে খোরাসান, আজারবাইজান ও ফারস নামক প্রদেশে ভাগ করা হয়। নিজের উইলে উমর আদেশ দেন যেন তাঁর মৃত্যুর এক বছর পর্যন্ত কোনো প্রশাসনিক পরিবর্তন করা না হয়। তাই খলিফা উসমান এক বছরের জন্য পূর্বের মতই প্রশাসনিক কাঠামো বজায় রাখেন। পরবর্তী কালে এতে পরিবর্তন আনা হয়। তিনি মিশরকে এক প্রদেশে পরিবর্তন করেন এবং উত্তর আফ্রিকাকে নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করেন। সিরিয়াও দুই প্রদেশের পরিবর্তে এক প্রদেশে পরিণত হয়। উসমানের খিলাফতের সময় সাম্রাজ্য ১২টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলঃ মদিনা, মক্কা, ইয়েমেন, কুফা, বসরা, জাজিরা, ফারস, আজারবাইজান, খোরাসান, সিরিয়া, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকা।

আলির খিলাফতের সময় মুয়াবিয়ার শাসিত সিরিয়া ও আমর ইবনুল আস শাসিত মিশর ছাড়া বাকি দশটি প্রদেশে পূর্বের প্রশাসনিক কাঠামো বজায় রাখা হয়।

প্রদেশগুলো আরো জেলায় ভাগ করা হত। এগুলো একেকজন গভর্নর বা ওয়ালি দ্বারা শাসিত হত। প্রশাসনিক পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তারা হলনঃ কাতিব, প্রধান সচিব। কাতিব উদ দিওয়ান, সামরিক সচিব। সাবিব উল খারাজ, রাজস্ব সংগ্রাহক। সাহিব উল আহদাস, প্রধান পুলিশ। সাহিব উল বাইতুল মাল, কোষাগার অফিসার।

কাজি, প্রধান বিচারক। অধিকাংশ প্রদেশে গভর্নর সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ হলেও কিছু প্রদেশে পৃথক সামরিক অফিসার থাকত। খলিফা নিজে অফিসারদের নিয়োগ দিতেন। নিয়োগ লিখিতভাবে দেয়া হত। নিয়োগের সময় গভর্নরের দায়িত্ব কীভাবে নির্বাহ করতে হবে তা জানিয়ে দেয়া হত।[42]

অফিসারদের প্রতি উমরের আদেশ ছিলঃ "মনে রেখ, আমি তোমাদেরকে আদেশদাতা বা অত্যাচারী হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছি না। আমি তোমাদের নেতা হিসেবে পাঠাচ্ছি যাতে মানুষ তোমাদের উদাহরণ অনুসরণ করতে পারে। মুসলিমদের তাদের অধিকার প্রদান কর এবং তাদের আঘাত কর না পাছে তারা অপমানিত হয়। তাদের অন্যায় প্রশংসা কর না পাছে তারা আত্মগরিমায় ভোগে। নিজেদের দরজা তাদের জন্য বন্ধ কর না পাছে তাদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলের অধিকার খর্ব করে ফেলে। এবং নিজেকে তাদের চেয়ে উচ্চতর হিসেবে আচরণ কর না, এটা তাদের উপর অত্যাচার।"

আবু বকরের খিলাফতের সময় রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছিল। তবে উমরের সময় রাজস্ব এবং আয়ের অন্যান্য উৎস বৃদ্ধি পায়। উমর দুটি কর প্রবর্তন করেন। একটি উশর বা আমদানী শুল্ক। রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগোচ্ছিল। ফলে উমর লোভলালসা ও দুর্নীতি থেকে কর্মকর্তাদেরকে দূরে রাখার জন্য তাদেরকে কঠোরভাবে শাসন করার নীতি অবলম্বন করেন। তাঁর শাসনকালে, প্রত্যেক কর্মকর্তার নিয়োগের সময় নিম্নোক্ত শপথ নিতে হতঃ কখনো তুর্কি ঘোড়ায় চড়া যাবে না। (এটাকে সে সময় আভিজাত্যের বস্তু ধরা হত)। কখনো উৎকৃষ্ট পোশাক পড়া যাবে না। চালুনি দ্বারা চালা আটা খাওয়া যাবে না। দরজায় দারোয়ান রাখা যাবে না। জনসাধারণের জন্য সবসময় দরজা খোলা রাখতে হবে।

তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এ নীতিগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতেন। উসমানের খিলাফতকালে রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে। নাগরিকদের জন্য বরাদ্দ ভাতা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয় এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অধিক স্থিতিশীল হয়ে উঠে। ফলে তাঁকে শপথের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারা প্রত্যাহার করতে হয়। নিয়োগের সময় ব্যক্তির সম্পদের হিসাব লিপিবদ্ধ করে রাখা হত। কোনো কর্মকর্তার সম্পদের মধ্যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেলে তাকে অবিলম্বে জবাবদিহিতার জন্য ডাকা হত এবং বেআইনি সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হত। প্রধান কর্মকর্তাদের হজের সময় মক্কায় আসতে হত। এসময় লোকেরা তাদের ব্যাপারে যেকোনো অভিযোগ করতে পারত। দুর্নীতি হ্রাসের করার জন্য উমর রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিদের উচ্চ বেতনের ব্যবস্থা করেন। প্রাদেশিক গভর্নররা যদি নিজস্ব অঞ্চলে সেনাবাহিনীর প্রধান হতেন তবে তাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পাশাপাশি বার্ষিক পাঁচ থেকে সাত হাজার দিরহাম করে পেতেন।[43]

উমাইয়া খিলাফত (৬৬১–৭৫০)

উমাইয়া খিলাফত (আরবি: الخلافة الأموية) ইসলামের প্রধান চারটি খিলাফতের মধ্যে দ্বিতীয় খিলাফত। এটি উমাইয়া রাজবংশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান ইবন আফ্ফানের খিলাফত লাভের মাধ্যমে উমাইয়া পরিবার প্রথম ক্ষমতায় আসে। তবে উমাইয়া বংশের শাসন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান কর্তৃক

42 The Cambridge History of Islam, ed. P.M. Holt, Ann K.S. Lambton, Bernard Lewis, Cambridge 1970.
43 মুহাম্মদ রেজা ই করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১৩৭।

সূচিত হয়। তিনি দীর্ঘদিন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। ফলে সিরিয়া উমাইয়াদের ক্ষমতার ভিত্তি হয়ে উঠে এবং দামেস্ক তাদের রাজধানী হয়। উমাইয়ারা মুসলিমদের বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখে। ককেসাস, ট্রান্সঅক্সানিয়া, সিন্ধু, মাগরেব ও ইবেরিয়ান উপদ্বীপ (আন্দালুস) জয় করে মুসলিম বিশ্বের আওতাধীন করা হয়। সীমার সর্বোচ্চে পৌছালে উমাইয়া খিলাফত মোট ৫.৭৯ মিলিয়ন বর্গ মাইল (১, ৫০, ০০, ০০০ বর্গ কিমি.) অঞ্চল অধিকার করে রাখে। তখন পর্যন্ত বিশ্বের দেখা সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ ছিল। অস্তিত্বের সময়কালের দিক থেকে এটি ছিল পঞ্চম।[44]

কিছু মুসলিমের কাছে উমাইয়াদের কর সংগ্রহ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনৈতিক ঠেকে। অমুসলিম জনগণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত এবং তাদের বিচারিক কার্যক্রম তাদের নিজস্ব আইন ও ধর্মীয় প্রধান বা নিজেদের নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা চালিত হত। তাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে জিজিয়া কর দিতে হত। মুহাম্মদ (সা) এর জীবদ্দশায় বলেন যে প্রত্যের ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মপালন করবে ও নিজেদের শাসন করতে পারবে। এ নীতি পরবর্তীতেও বহাল থাকে। উমর কর্তৃক চালু হওয়া মুসলিম ও অমুসলিমদের জন্য কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলতে থাকে। রাষ্ট্রে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল।[45] উমাইয়ারা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে ধারাবাহিক যুদ্ধে জড়িত ছিল। গুরুত্বপূর্ণ পদে খ্রিষ্টানদের বসানো হয় যাদের মধ্যে কারো কারো পরিবার বাইজেন্টাইন সরকারে কাজ করেছিল। খ্রিষ্টানদের নিয়োগ অধিকৃত অঞ্চলে বিশেষত সিরিয়ার বিশাল খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর প্রতি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ নীতি জনগণের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয় এবং সিরিয়াকে ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে স্থিতিশীল করে তোলে।

আরব গোত্রগুলোর মধ্যকার বিরোধের কারণে সিরিয়ার বাইরের প্রদেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বিশেষত দ্বিতীয় মুসলিম গৃহযুদ্ধ (৬৮০-৬৯২) ও বার্বার বিদ্রোহের (৭৪০-৭৪৩) সময়। দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের সময় উমাইয়া গোত্রের নেতৃত্ব সুফয়ানি শাখা থেকে মারওয়ানি শাখার হস্তান্তর হয়। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সম্পদ ও লোকবল কমে আসায় তৃতীয় মুসলিম গৃহযুদ্ধের সময় দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চূড়ান্তভাবে আব্বাসীয় বিপ্লবের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হয়। পরিবারের একটি শাখা উত্তর আফ্রিকা হয়ে আল-আন্দালুস চলে যায় এবং সেখানে কর্ডোবা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে। এ খিলাফত ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল এবং আন্দালুসের ফিতনার পর এর পতন হয়।

অনেক ইতিহাসবিদের মতে খলিফা মুয়াবিয়া (শাসনকাল ৬৬১-৬৮০) রাজবংশীয় কায়দার প্রথম শাসক হলেও তিনি উমাইয়া রাজবংশের দ্বিতীয় শাসক। উমাইয়া গোত্রের সদস্য উসমান ইবনে আফ্‌ফানের খিলাফতের সময় উমাইয়া গোত্র ক্ষমতায় আসে। উসমান তার গোত্রের কিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসান। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন উসমানের শীর্ষ পর্যায়ের উপদেষ্টা মারওয়ান ইবনুল হাকাম যিনি সম্পর্কে উসমানের তুতো ভাই ছিলেন। তার কারণে হাশিমি সাহাবিদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরী হয় কারণ মারওয়ান ও তার পিতা আল-হাকাম ইবনে আবুল আসকে মুহাম্মদ (সা) মদিনা থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেছিলেন। উসমান কুফার গভর্নর হিসেবে তার সৎ ভাই ওয়ালিদ ইবনে উকবাকে নিযুক্ত করেন। হাশিমিরা তার প্রতি অভিযোগ করে যে তিনি মদপান করে নামাজের ইমামতি করেছিলেন। উসমান মুয়াবিয়াকে বিশাল এলাকার কর্তৃত্ব দিয়ে সিরিয়ার গভর্নর

44 Yahya Blankinship Khalid , The End of the Jihad State, the Reign of Hisham Ibn 'Abd-al Malik and the collapse of the Umayyads, State University of New York Press, p. 37.
45 H.U. Rahman , A Chronology Of Islamic History, ed. 1999, Page 128.

হিসেবে তার অবস্থান সংহত করেন[46] এবং তার পালক ভাই আবদুল্লাহ ইবনে সাদকে মিশরের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন। এসব কারণে হযরত উসমানের বিরুদ্ধে স্বার্থবাদী মুনাফিকরা স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এনেছিলেন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনজনদের নিয়োগ তার নিজের বংশীয় কোন স্বার্থে নয় বরং জনগণের সার্বিক কল্যাণকে বিবেচনা করে এবং যোগ্যতার পরিপূর্ণ বিচার করেই তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনজনকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। হযরত উসমান নিজের কোনো উত্তরসুরি মনোনীত করে যাননি তাই তাকে উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ধরা হয় না।

৭১২ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম ইন্দুজ নদীসহ সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চল জয় করেন। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের জয় উমাইয়া খিলাফতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিজয় ছিল। রাজস্থানের যুদ্ধের পর সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া থেমে যায়। আরবরা ভারত আক্রমণের চেষ্টা করে কিন্তু উত্তর ভারতের রাজা নাগাভাতা ও দক্ষিণ ভারতের সম্রাট দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য তাদের পরাজিত করেন। আরব লেখকদের ভাষ্যমতে এরপর খলিফা মাহদি ভারত বিজয়ের পরিকল্পনা বাদ দেন।

৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রথম ইয়াজিদ তার উত্তরাধিকারি হন। অনেক নামকরা মুসলিম ইয়াজিদের ক্ষমতালাভের বিরোধী ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুহাম্মদ (সা) এর এক সাহাবির ছেলে আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়ের ও চতুর্থ খলিফার পুত্র হুসাইন ইবনে আলি। ফলশ্রুতিতে ঘটে যাওয়া সংঘাত দ্বিতীয় ফিতনা বলে পরিচিত।

৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়ের মক্কার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। ইয়াজিদের বিপক্ষে হুসাইনের অবস্থানের কথা শুনে কুফার জনগণ হুসাইনের কাছে তাদের সমর্থন নেয়ার জন্য আবেদন জানায়। হুসাইন তার চাচাত ভাই মুসলিম বিন আকিলকে এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঠান। এ খবর ইয়াজিদের কাছে পৌছলে তিনি বসরার শাসক উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে কুফার জনগণকে হুসাইনের নেতৃত্বে সমবেত হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার দায়িত্ব দেন। উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ মুসলিম বিন আকিলের পাশে থাকে জনতাকে প্রতিহত করতে সক্ষম এবং তাকে গ্রেপ্তার করেন। উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের উপর হুসাইনকে প্রতিহত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে শুনে মুসলিম বিন আকিল তাকে অনুরোধ করেন যাতে হুসাইনকে কুফায় না আসার ব্যাপারে জানিয়ে চিঠি দেয়া হয়। তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ মুসলিম বিন আকিলকে হত্যা করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়ের আমৃত্যু মক্কায় থেকে যান। হুসাইন সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি তার পরিবারসহ কুফায় যাবেন। সমর্থনের অভাবের বিষয়ে তার এসময় জানা ছিল না। হুসাইন ও তার পরিবারকে ইয়াজিদের সেনাবাহিনী রুখে দেয়। এসময় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আমরু বিন সাদ, শামার বিন জিয়ালজোশান ও হুসাইন বিন তামিম। তারা হুসাইন ও তার পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সাথে লড়াই করে হত্যা করে। হুসাইনের দলে ২০০ জন মানুষ ছিল যাদের অধিকাংশ ছিল নারী। এদের মধ্যে হুসাইনের বোন, স্ত্রী, মেয়ে ও তাদের সন্তানরা ছিল। নারী ও শিশুদেরকে যুদ্ধবন্ধী হিসেবে দামেস্কে ইয়াজিদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। হুসাইনের মৃত্যু ও তার পরিবারের বন্দী হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে জনগণের সমর্থন তার দিক থেকে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের বন্দী করে রাখা হয়। এরপর তাদের মদিনা ফিরে

46 Ibn Kathir, Al-Bidayah wal-Nihayah, V. 8 p. 164.

যেতে দেয়া হয়। বেঁচে যাওয়া একমাত্র পুরুষ সদস্য ছিলেন আলি ইবনে হুসাইন জয়নুল আবেদিন। অসুস্থতার কারণে কাফেলা আক্রান্ত হওয়ার সময় তিনি লড়াই করতে পারেননি।

মক্কায় অবস্থান করলেও হুসাইনের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়ের আরো দুটি প্রতিপক্ষ দলের সাথে যুক্ত হন। এর একটি মদিনা ও অন্যটি বসরা ও আরবের খারিজিরা সংঘটিত করে। মদিনা ছিল হুসাইনসহ মুহাম্মদ (সা) ও তার পরিবারের বাসস্থান, তার মৃত্যু ও পরিবারের বন্দী হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে বিরাট আকারে প্রতিপক্ষ সৃষ্টি হয়। ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াজিদ আন্দোলন দমন করতে সেনাবাহিনী পাঠান। হাররাহর যুদ্ধে সেনারা মদিনার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে। মদিনার মসজিদে নববী ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইয়াজিদের সেনারা এগিয়ে গিয়ে মক্কা অবরোধ করে। অবরোধের এক পর্যায়ে আগুনে কাবার ক্ষতি হয়। কাবা ও মসজিদে নববীর ক্ষতিসাধনের ঘটনা পরবর্তী ইতিহাসবিদদের কাছে বেশ সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়।

অবরোধ চলার সময় ইয়াজিদ মৃত্যুবরণ করেন এবং উমাইয়া সেনারা দামেস্কে ফিরে আসে। আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়ের মক্কার নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। ইয়াজিদের পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়া (শাসনকাল ৬৮৩-৮৪) তার উত্তরসুরি হন কিন্তু সিরিয়ার বাইরে খলিফা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন না। সিরিয়ার ভেতর দুটি দল তৈরী হয়, একটি হল কায়সদের দল, এরা আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়েরকে সমর্থন করত, আরেকটি হল কুদাদের দল যারা প্রথম মারওয়ানকে সমর্থন করত। মারওয়ানের সমর্থকরা মারজ রাহিতের যুদ্ধে বিজয়ী হয় এবং ৬৮৪ তে মারওয়ান খলিফার পদে আরোহণ করেন।

প্রথম মারওয়ানি- মারওয়ানের প্রথম কাজ ছিল এসময় ইসলামি বিশ্বের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে খলিফা হিসেবে স্বীকৃত আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়েরের বিদ্রোহী দলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। মারওয়ান মিশর অধিকার করেন ও নয় মাস শাসন করার পর ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

মারওয়ানের পর তার পুত্র আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান (শাসনকাল ৬৮৫-৭০৫) খলিফা হন। তিনি খিলাফতের উপর উমাইয়াদের কর্তৃত্ব সংহত করেন। তার শাসনের প্রথমদিকে কুফাভিত্তিক আল-মুখতারের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। আল-মুখতার আলির আরেক পুত্র মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াকে খলিফা হিসেবে দেখতে চাইতেন। তবে বিদ্রোহের সাথে ইবনুল হানাফিয়ার কোনো সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায় না। আল-মুখতারের সেনারা ৬৮৬তে উমাইয়াদের সাথে ও ৬৮৭তে আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়েরের সেনাদের সাথে লড়াই করে এবং পরাজিত হয়। ফলে তার বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া সেনারা পুনরায় ইরাক অধিকার করে ও একই বাহিনী মক্কা দখল করে। আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়ের হামলায় নিহত হন।

আবদুল মালিককে প্রশাসনকে কেন্দ্রিভুত করা ও আরবিকে সরকারি ভাষা করার কৃতিত্ব দেয়া হয়। তিনি স্বতন্ত্র মুসলিম মুদ্রা চালু করেন। ইতিপূর্বে বাইজেন্টাইন ও সাসানীয় মুদ্রা ব্যবহার হত। আবদুল মালিক বাইজেন্টানটিয়ামের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। সেবাস্টপলিসের যুদ্ধে বাইজেন্টাইনরা পরাজিত হয় এবং আর্মেনিয়া ও ককেসিয়ান ইবেরিয়ায় কর্তৃত্ব পুনপ্রতিষ্টা করা হয়।

আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রথম আল ওয়ালিদ (শাসনকাল ৭০৫-১৫) খলিফা হন। আল ওয়ালিদ একজন দক্ষ নির্মাতা ছিলেন। তিনি মসজিদে নববী ও দামেস্কের উমাইয়া মসজিদ নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেন।

আবদুল মালিক ও আল ওয়ালিদ উভয়ের শাসনের সময়কার একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। অনেক ইরাকি উমাইয়া শাসনের বিরোধি ছিল। শান্তি বজায় রাখার জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিরিয়া সেনাদের ইরাকে নিয়ে আসেন। নতুন গেরিসন শহর ওয়াসিতে তাদের স্থান দেয়া হয়। বিদ্রোহ দমনে এই সেনারা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আল ওয়ালিদের পর তার ভাই সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক (শাসনকাল ৭১৫-১৭) খলিফা হন। তার শাসনকালে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করা হয়। অবরোধ ব্যর্থ হলে বাইজেন্টাইন রাজধানী জয়ে আরবদের উৎসাহে ভাটা পড়ে। তবে অষ্টম শতকের প্রথম দুই দশক খিলাফত ক্রমাগতভাবে বিস্তৃত হচ্ছিল যা পশ্চিমে ইবেরিয়ান উপদ্বীপ থেকে পূর্বে ট্রান্সঅক্সানিয়া ও উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সুলায়মানের পর তার তুতো ভাই উমর ইবনে আবদুল আজিজ (শাসনকাল ৭১৭-২০) খলিফা হন। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে তার স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে। তিনি একমাত্র উমাইয়া খলিফা যাকে প্রচলিত অর্থে সম্রাট হিসেবে নয় বরং প্রকৃত অর্থে খলিফা বিবেচনা করা হয়। উমর ইবনে আব্দুল আজিককে অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য কৃতিত্ব দেয়া হয়।

উমরের মৃত্যুর পর আবদুল মালিকের আরেক পুত্র দ্বিতীয় ইয়াজিদ (শাসনকাল ৭২০-২৪) খলিফা হন। ইয়াজিদ খিলাফতের সীমানার ভেতরের খ্রিষ্টান ছবি মুছে ফেলার আদেশ দেন। ৭২০ এ ইরাকে ইয়াজিদ ইবনুল মুহাল্লাবের নেতৃত্ব আরেকটি বড় আকারের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

আবদুল মালিকের আরেক পুত্র হিশাম ইবনে আবদুল মালিক (শাসনকাল ৭২৪-৭৪৩) এরপর খলিফা হন। তার দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল শাসনকাল সামরিক অভিযান সংক্ষিপ্তকরণের কারণে চিহ্নিত করা হয়। হিশাম উত্তর সিরিয়ার রিসাফাতে তার দরবার স্থাপন করেন। এটি দামেস্কের চেয়ে বাইজেন্টাইন সীমান্তের বেশি কাছে ছিল। বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পুনরায় শুরু হয় এবং কনস্টান্টিনোপল শেষবার অবরোধ করে ব্যর্থ হওয়ার পর তা শেষ হয়। নতুন অভিযানের মধ্যে ছিল আনাতোলিয়ায় সফল অভিযান। এক্রোইননের যুদ্ধে পরাজয়ের পর আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সীমানা বিস্তৃতি হয়নি।

হিশামের শাসনের সময় ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে টুরসের যুদ্ধে ফ্রেঙ্কদের কাছে আরব সেনাদের পরাজয়ের পর পশ্চিমদিকে সীমানা সম্প্রসারণ সমাপ্ত হয়। ৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় বার্বার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এটিকে খুব কষ্টে দমন করা হয়। ককেসাসে খাজারদের সাথে লড়াই চূড়ান্তে পৌছায়। আরবরা ডেরবেন্টে একটি সামরিক ঘাঁটি তৈরী করে এবং উত্তর ককেসাসে বেশ কয়েকটি আক্রমণ চালায়। কিন্তু যাযাবর খাজারদের পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। সংঘর্ষ খুবই রক্তাক্ত ছিল। ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে আরব সেনারা আরাদাবিলের যুদ্ধে পরাজিত হয়। মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ, পরবর্তীতে দ্বিতীয় মারওয়ান, ৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে শেষপর্যন্ত অভিযান সমাপ্ত করেন। তারা ভলগা পর্যন্ত পৌছালেও খাজাররা তাদের আওতার বাইরে ছিল। হিশাম পূর্বদিকেও পরাজয়ের সম্মুখিন হয়। তার সেনারা তোখারিস্তান ও

ট্রান্সঅক্সানিয়া জয় করার চেষ্টা করে। দুটি এলাকাই ইতোমধ্যে আংশিকভাবে অধিকৃত হয়। কিন্তু এগুলো শাসন করা কষ্টসাধ্য ছিল। এসময় আরেকবার অনারবদের ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়, বিশেষত ট্রান্সঅক্সানিয়ার সোগডিয়ানদের ক্ষেত্রে। ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে পিপাসার দিনে উমাইয়াদের পরাজয়ের পর খোরাসানের গভর্নর আশরাস ইবনে আবদুল্লাহ আলসুলামি ইসলামে ধর্মান্তরিত সোগডিয়ানদের কর মওকুফের প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু যখন এ কথা খুবই বেশি জনপ্রিয়তা পায় ও রাজস্বের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রতীয়মানে হয় তখন তিনি তা তুলে নেন। ৭৩১ ডিফাইলের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পর খোরাসানি আরবদের বিরোধ বৃদ্ধি পায়। আলহারিস ইবনে সুরায়জ একটি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন এবং বলখ অধিকার করেন। তবে মার্ভ অধিকার করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনার পর আলহারিসের কার্যক্রম শেষ হয়ে গিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় কিন্তু অনারব মুসলিমদের অধিকারের প্রশ্নটি উমাইয়াদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করে।

হিশামের পর দ্বিতীয় ইয়াজিদের পুত্র দ্বিতীয় আল-ওয়ালিদ (শাসনকাল ৭৪৩-৪৪) খলিফা হন। তার ব্যাপারে বলা হয় যে তিনি ধর্মীয় দিকের চেয়ে বরং পার্থিব সুখভোগের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন। বিরোধিদের মৃত্যুদন্ড দানে ও কাদারিয়াদের উপর নির্যাতনের মাধ্যমে দ্রুত তিনি অনেকের শত্রুতে পরিণত হন। ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ওয়ালিদের এক পুত্র তৃতীয় ইয়াজিদ দামেস্কে নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। তার সেনারা দ্বিতীয় আল-ওয়ালিদকে হত্যা করে। তৃতীয় ইয়াজিদ দয়াপ্রদর্শনের জন্য সুনাম অর্জন করেন এবং কাদারিয়াদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। শাসনের ছয় মাসের মাথায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ইয়াজিদ তার ভাই ইব্রাহিমকে তার উত্তরসুরি মনোনীত করেন। কিন্তু প্রথম মারওয়ানের নাতি দ্বিতীয় মারওয়ান (শাসনকাল ৭৪৪-৫০) উত্তর দিক থেকে একটি সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসেন ও ৭৪৪ এর ডিসেম্বরে দামেস্কে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। মারওয়ান তাৎক্ষনিকভাবে উত্তরে বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত হারানে তার রাজধানী সরিয়ে নেন। সিরিয়ায় শীঘ্রই বিদ্রোহ দেখা দেয়, সম্ভবত রাজধানী স্থানান্তরের কারণে। ৭৪৬ এ মারওয়ান পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে হিমস ও দামেস্কে চারপাশের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেন।

ইরাক ও ইরানের খারিজিদের কাছ থেকে মারওয়ান প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তারা প্রথমে দাহহাক ইবন কায়স আল শায়বানি ও পরে আবু দুলাফকে বিদ্রোহী খলিফা হিসেবে মনোনীত করে। মারওয়ান ইরাকে পুনরায় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হন কিন্তু এসময় খোরাসানে আরো বড় হুমকির জন্ম হয়।

আব্বাসীয় বিপ্লব- আব্বাসীয় পরিবার কর্তৃক পরিচালিত হাশিমিয়া আন্দোলন উমাইয়া খিলাফতকে উৎখাত করে। আব্বাসীয়রা হাশিমি গোত্রের সদস্য ছিল। তবে হাশিমিয়া শব্দটি আলির নাতি ও মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার পুত্র আবু হাশিম থেকে এসেছে বলে মনে হয়। কিছু সূত্রমতে আব্বাসীয় পরিবারের প্রধান আবু হাশিম ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি মুহাম্মদ ইবনে আলি তার উত্তরসুরি মনোনীত করে যান। আল-মুখতারের ব্যর্থ বিদ্রোহের সমর্থকদের নিয়ে আব্বাসীয়রা এগিয়ে যায়। তারা নিজেদেরকে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার সমর্থক হিসেবে তুলে ধরে।

৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হওয়া হাশিমিয়া কর্মকাণ্ড খোরাসানে অনুগত লোক খুজতে থাকে। তারা মুহাম্মদ (সা) এর পরিবারের একজন সদস্যের জন্য সমর্থনের ডাক দেয়। তবে আব্বাসীয়দের কথা বলা হয়নি। এই কার্যক্রম আরব ও অনারব (মাওয়ালি) উভয়ের মধ্যেই সফল হয়। তবে দ্বিতীয় দলটি আন্দোলনের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৭৪৬ এর দিকে আবু মুসলিম খোরাসানে হাশিমিয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কালো পতাকার অধীনে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করেন। তিনি শীঘ্রই খোরাসানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন, এর উমাইয়া গভর্নর নাসর ইবনে সায়ারকে বহিষ্কার করেন এবং পশ্চিমদিকে একটি সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কুফা হাশিমিয়াদের হস্তগত হয়। এটি ইরাকে উমাইয়াদের শেষ শক্ত ঘাঁটি ছিল। ওয়াসিতে অবরোধ করা হয় এবং সে বছরের নভেম্বরে আবুল আবাস কুফার মসজিদে খলিফা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। এর ফলে মারওয়ান তার সেনাদেরকে হারান থেকে ইরাকের দিকে পরিচালিত করেন। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি দুই বাহিনী জাবের যুদ্ধে মুখোমুখি হয় এবং উমাইয়ারা পরাজিত হয়। এপ্রিলে দামেস্ক আব্বাসীয়দের হাতে এসে পড়ে এবং আগস্টে মারওয়ানকে মিশরে হত্যা করা হয়।

বিজয়ীরা সিরিয়ায় উমাইয়াদের কবরগুলোকে অবমাননা করা শুরু করে। শুধু দ্বিতীয় উমরের কবরের প্রতি কিছু করা হয়নি। উমাইয়া পরিবারের বাকি সদস্যদের অনুসরণ করা হয় ও হত্যা করা হয়। আব্বাসীয়রা উমাইয়া পরিবারের সদস্যদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করলে আশিজন ক্ষমা গ্রহণ করতে আসে এবং সবাইকে হত্যা করা হয়। হিশামের একজন নাতি প্রথম আবদুল রহমান বেঁচে যান এবং আল-আন্দালুস রাজ্য স্থাপন করেন এবং কর্ডোবা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

খলিফাদের তালিকা

দামেস্কের খলিফা

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ৬৬১–৬৮০ খ্রি.

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া ৬৮০–৬৮৩

মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ ৬৮৩–৬৮৪

মারওয়ান ইবনে আল হাকাম ৬৮৪–৬৮৫

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ৬৮৫–৭০৫

আল ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক ৭০৫–৭১৫

সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক ৭১৫–৭১৭

উমর ইবনে আবদুল আজিজ ৭১৭–৭২০

ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালিক ৭২০–৭২৪

হিশাম ইবনে আবদুল মালিক ৭২৪–৭৪৩

আল ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদ ৭৪৩–৭৪৪

ইয়াজিদ ইবনে আল ওয়ালিদ ৭৪৪

ইবরাহিম ইবনুল ওয়ালিদ ৭৪৪

মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ (জাজিরার হারান থেকে শাসন করেন) ৭৪৪–৭৫০

কর্ডোবার আমির

প্রথম আবদুর রহমান ৭৫৬–৭৮৮

প্রথম হিশাম ৭৮৮–৭৯৬

প্রথম আল হাকাম ৭৯৬–৮২২

দ্বিতীয় আবদুর রহমান ৮২২–৮৫২

প্রথম মুহাম্মদ ৮৫২–৮৮৬

আল মুনজির ৮৮৬–৮৮৮

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ৮৮৮–৯১২

তৃতীয় আবদুর রহমান ৯১২–৯২৯

কর্ডোবার খলিফা

তৃতীয় আবদুর রহমান, খলিফা হিসেবে ৯২৯–৯৬১

দ্বিতীয় আল হাকাম ৯৬১–৯৭৬

দ্বিতীয় হিশাম ৯৭৬–১০০৮

দ্বিতীয় মুহাম্মদ ১০০৮–১০০৯

সুলাইমান ইবনুল হাকাম ১০০৯–১০১০

দ্বিতীয় হিশাম, পুনরায় ক্ষমতালাভ ১০১০–১০১২

সুলাইমান ইবনুল হাকাম, পুনরায় ক্ষমতালাভ ১০১২–১০১৭

চতুর্থ আবদুর রহমান ১০২১–১০২২

পঞ্চম আবদুর রহমান ১০২২–১০২৩

তৃতীয় মুহাম্মদ ১০২৩–১০২৪

তৃতীয় হিশাম (কর্ডোবা) ১০২৭–১০৩১[47]

আব্বাসী খিলাফত (৭৫০খ্রি.- ১২৫৮খ্রি.)

আব্বাসীয় খিলাফত (আরবি: الخلافة العباسية) ইসলামী খিলাফতগুলোর মধ্যে তৃতীয় খিলাফত। এটি আব্বাসীয় বংশ কর্তৃক শাসিত হয়। বাগদাদ এই খিলাফতের রাজধানী ছিল। উমাইয়া খিলাফতকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে আন্দালুসে উমাইয়া খিলাফত উৎখাত করা যায়নি।

আব্বাসীয় খিলাফত আবুল আব্বাস আস সাফফাহ কর্তৃক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে কুফায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। পারস্যে ১৫০ বছর ধরে নিয়ন্ত্রণ করার পর খলিফাকে প্রধান কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়ে স্থানীয় আমিরদের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চাপ দেয়া হয়। খিলাফতকে তার পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ আন্দালুস, মাগরেব ও ইফ্রিকিয়া যথাক্রমে একজন উমাইয়া যুবরাজ, আগলাবি ও ফাতেমীয় খিলাফতের কাছে হারাতে হয়।

মঙ্গোল নেতা হালাকু খানের বাগদাদ দখলের পর ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় খিলাফত বিলুপ্ত হয়। মামলুক শাসিত মিশরে অবস্থান করে তারা ১৫১৯ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব দাবি করতে থাকেন। এরপর উসমানীয় সাম্রাজ্যের কাছে ক্ষমতা চলে যায় ও কনস্টান্টিনোপলে রাজধানী স্থাপিত হয়।

নৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে আক্রমণ করে আব্বাসীয়রা নিজেদেরকে তাদের চেয়ে আলাদা হিসেবে তুলে ধরে। ইরা লেপিডাসের মতে, "আব্বাসীয় বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে আরবদের দ্বারা সমর্থিত ছিল, যারা ছিল মূলত মারুর বসতি স্থাপনকারী, সে সাথে ইয়েমেনি গ্রুপ ও তাদের মাওয়ালি।"[48] মাওয়ালি তথা অনারব মুসলিমরা কাছে

[47] মুহাম্মদ রেজা ই করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭- ২০১।
[48] Ira Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge University Press, p. 54.

আব্বাসীয়দের পক্ষে ছিল। আব্বাসের প্রপৌত্র মুহাম্মদ ইবনে আলি আব্বাসি মুহাম্মদ (সা) এর পরিবারের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য দ্বিতীয় উমরের সময় পারস্যে প্রচারণা শুরু করেন।

দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় আব্বাসের চতুর্থ বংশধর ইবরাহিম বিরোধিতা শুরু করেন। খোরাসান প্রদেশ ও শিয়া আরবদের কাছ থেকে সমর্থন লাভের মাধ্যমে তিনি বেশ সাফল্য অর্জন করলেও ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ধরা পড়েন এবং কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। কারো মতে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর তার ভাই আবদুল্লাহ প্রতিবাদ এগিয়ে নেন। তিনি আবুল আব্বাস আস সাফাহ নামে পরিচিত হন। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উমাইয়াদের জাবের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন।[49]

বিজয়ের পর তিনি মধ্য এশিয়ায় সেনা পাঠান। তার সেনারা তালাসের যুদ্ধে ট্যাং রাজবংশের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। বাগদাদকে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখা বারমাকিরা বাগদাদে পৃথিবীর প্রথম কাগজ কলের প্রচলন ঘটায়। এভাবে আব্বাসীয় শাসনামলে নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণ ঘটে। দশ বছরের মধ্য আব্বাসীয়রা স্পেনে উমাইয়া রাজধানী কর্ডোবাতে আরেকটি নামকরা কাগজ কল নির্মাণ করে।

আব্বাসীয়দের প্রথম পরিবর্তন ছিল সাম্রাজ্যের রাজধানী দামেস্ক থেকে বাগদাদে সরিয়ে আনা। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে পারসিয়ান মাওয়ালিদের অধিক কাছে টানা যায়। ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে টাইগ্রিস নদীর তীরে বাগদাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় দায়িত্বপালনের জন্য উজির নামক নতুন পদ সৃষ্টি করা হয় এবং স্থানীয় আমিরদের উপর বড় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উজিররা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করাতে আব্বাসীয় খলিফারা অধিক মাত্রায় আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রাচীন আরব অভিজাততন্ত্র পারস্যের আমলাতন্ত্রের কারণে প্রতিস্থাপিত হয়ে পড়ে।[50]

উমাইয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আব্বাসীয়রা পারসিয়ানদের সাহায্যের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। আবুল আব্বাসের উত্তরসুরি আল মনসুর অনারব মুসলিমদেরকে তার দরবারে স্বাগতম জানান। এর ফলে আরব ও পারস্যের সংস্কৃতি মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। তবে অনেক আরব সমর্থক বিশেষ করে খোরাসানের আরব যারা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে তাদের সহায়তা করেছিল, তারা বিরূপ হয়।

সমর্থকদের মধ্যের এই ফাটল সমস্যার জন্ম দেয়। উমাইয়া ক্ষমতার বাইরে থাকলেও ধ্বংস হয়ে যায়নি। উমাইয়া রাজপরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য স্পেন চলে যান এবং সেখানে নিজেকে একজন স্বাধীন আমির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন (প্রথম আবদুর রহমান, ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)। ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় আবদুর রহমান নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন এবং আল আন্দালুসে বাগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর আন লুশানের বিরুদ্ধে ট্যাং রাজবংশকে সহায়তার জন্য ৪, ০০০ আরব সৈনিক পাঠান। যুদ্ধের পর সৈনিকরা চীনে থেকে যায়। আরব খলিফা হারুনুর রশিদ চীনের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। ট্যাং বিবরণীতে আব্বাসীয়দের সাথে চীনের দরবারের সম্পর্ক লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস, বাগদাদের প্রতিষ্ঠাতা আল মনসুর, ও আরব্য রজনীতে

49 “Abbasid", Encyclopedia Britannica, 15th edition, p. 10.
50 ”The Islamic World to 1600”, Applied History Research Group, University of Calgary.

অধিক উল্লেখিত হারুনুর রশিদ। ট্যাং রাজবংশের বিবরণীতে আব্বাসীয়দের " The Black-robed Arabs." বলে উল্লেখ করা হয়। হারুনুর রশিদ দূত পাঠানোর মাধ্যমে ট্যাং রাজবংশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলকেমি, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞানসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আরব বিজ্ঞানীরা এগিয়ে ছিলেন।[51]

বাগদাদে মোঙ্গল আক্রমণের আগ পর্যন্ত অতিক্রান্ত সময়কে ইসলামি স্বর্ণযুগ বলে গণ্য করা হয়। আব্বাসীয়দের ক্ষমতায় আগমন ও রাজধানী দামেস্ক থেকে বাগদাদে স্থানন্তরের পর থেকে স্বর্ণযুগ শুরু হয়। আব্বাসীয়রা কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানের প্রতি উৎসাহমূলক বাণীতে অণুপ্রাণিত হয়। বাগদাদে বাইতুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা ও আব্বাসীয়দের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহের কারণে এসময় মুসলিম বিশ্ব বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, শিক্ষার বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হয়ে উঠে। মুসলিম ও অমুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পন্ডিত ব্যক্তিরা বিশ্বের জ্ঞানকে আরবিতে অনুবাদ করার কাজে নিয়োজিত হন। হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এমন অনেক ধ্রুপদি কাজ আরবি ও ফারসিতে এবং পরবর্তীতে তুর্কি, হিব্রু, ও ল্যাটিনে অনুবাদ করা হয়। মুসলিম বিশ্ব বিভিন্ন সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ার স্থলে পরিণত হয় এবং প্রাচীন রোম, চীন, ভারত, পারস্য, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, গ্রিক ও বাইজেন্টাইন সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যায়। হারুনুর রশিদ ও তার উত্তরসুরিদের শাসনকালে ব্যাপকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন সম্পন্ন হয়।

মধ্যযুগের বেশ কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানী ইসলামি বিজ্ঞানকে খ্রিষ্টান পাশ্চাত্যে পৌছানোয় ভূমিকা রাখেন। এই ব্যক্তিরা এরিস্টোটলকে খ্রিষ্টান ইউরোপে পরিচিত করান। অধিকন্তু এ যুগে ইউক্লিড ও টলেমির আলেক্সান্দ্রিয়ান গণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান পুনরায় ফিরে আসে। ফিরে পাওয়া গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলো পরবর্তীতে মুসলিম পন্ডিত, বিশেষ করে আল বিরুনি ও আবু নাসর মনসুরের মাধ্যমে বর্ধিত ও আরো উন্নত হয়।

খ্রিষ্টানরা (বিশেষ করে নেস্টোরিয়ান খ্রিষ্টান) উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে আরব ইসলামি সভ্যতার বিকাশে অবদান রাখে। তারা গ্রিক দার্শনিকদের রচনা সিরিয়াক ও পরবর্তীতে আরবিতে অনুবাদ করে। নেস্টোরিয়ানরা আরব সংস্কৃতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জুন্দশাপুরের শিক্ষালয় সাসানীয়, উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রায় আট প্রজন্ম ধরে নেস্টোরিয়ান বুখতিশু পরিবার খলিফা ও অষ্টম থেকে একাদশ শতকের সুলতানদের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে কাজ করে।

বিজ্ঞানী আল খোয়ারিজমি তার গ্রন্থ কিতাব আল জাবর ওয়াল মুকাবালাতে বীজগণিত নিয়ে আলোচনা করেন। এই গ্রন্থ থেকে ইংরেজি এলজেব্রা শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে। তাই তাকে বীজগণিতের জনক বলা হয়। তবে অনেকে গ্রিক গণিতবিদ ডিওফেনটাসকে এই উপাধি দেয়। এলগোরিজম ও এলগরিদম পদদুটিও তার নাম থেকেই উদ্ভব হয়। তিনি ভারত উপমহাদেশের বাইরে আরবি সংখ্যা পদ্ধতি ও হিন্দু-আরবি সংখ্যা পদ্ধতি সূচনা করেন।

ইবনে আল হাইসাম (পাশ্চাত্যে আলহাজেন নামে পরিচিত) ১০২১ খ্রিষ্টাব্দে তার গ্রন্থ কিতাব আল মানাজিরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তত্ত্বের সাথে পরীক্ষালব্ধ উপাত্তের সমন্বয়ের জন্য পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা, যা মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। ইবনে আল হাইসাম বস্তু দেখার ক্ষেত্রে

51 Charles Patrick Fitzgerald, China: A Short Cultural History, p. 332.

আলোর চোখের ভেতর প্রবেশের প্রমাণ দেন যা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে ধরা হয়। ব্রেডলি স্টেফেনস ইবনে আল হাইসামকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটানোর জন্য "প্রথম বিজ্ঞানী" হিসেবে উল্লেখ করেন।

আব্বাসীয় আমলে মুসলিম জগৎে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নয়ন ঘটে। ৯ম শতকে বাগদাদে ৮০০ জন চিকিৎসক ছিল এবং এনাটমি ও রোগের উপর ব্যাপক আবিষ্কার সম্পন্ন হয়। হাম ও গুটিবসন্তের মধ্যে পার্থক্য এসময় বর্ণিত হয়। খ্যাতনামা পারসিয়ান বিজ্ঞানী ইবনে সিনা (পাশ্চাত্যে আভিসেনা নামে পরিচিত) বিজ্ঞানীদের অর্জিত বিশাল পরিমাণ জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করেন এবং তার বিশ্বকোষ কানুন ফিততিব ও কিতাবুশ শিফার মাধ্যমে তা বেশ প্রভাববিস্তারকারী ছিল। তিনি ও আরো অনেকের গবেষণাকর্ম রেনেসার সময় ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের সরাসরি প্রভাবিত করে।

মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে জ্যোতির্বিজ্ঞান আল বাত্তানির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। তিনি পৃথিবীর অক্ষের ঘূর্ণনের উপর গবেষণা করেন। আল বাত্তানি, ইবনে রুশদ, নাসিরুদ্দিন তুসি, মুয়ায়েদুদ্দিন উরদি ও ইবনে আল শাতির কর্তৃক ভূকেন্দ্রিক মডেলের সংশোধন পরবর্তীতে কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মডেলে ব্যবহৃত হয়। গ্রীকরা এস্ট্রোলেব নির্মাণ করলেও মুসলিম জ্যোতির্বিদ ও প্রকৌশলীরা এর বিকাশ ঘটান এবং এরপর তা মধ্যযুগের ইউরোপে পৌঁছায়।

মুসলিম আলকেমিস্টরা মধ্যযুগের ইউরোপীয় আলকেমিস্টদের প্রভাবিত করেন, বিশেষত জাবির ইবনে হাইয়ানের রচনার মাধ্যমে। পাতনসহ বেশ কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়া মুসলিম বিশ্বে উদ্ভব হয় এবং এরপর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

সাহিত্য- ইসলামি বিশ্বে জন্ম নেয়া সবচেয়ে পরিচিত সাহিত্য হল সহস্র এক রজনীর গ্রন্থ যা আরব্য রজনী নামে পরিচিত। মূল ধারণা ইসলাম পূর্ব ইরানি উপাদান থেকে আসে। এর সাথে ভারতীয় উপাদানও যুক্ত হয়। এতে বাকি মধ্যপ্রাচ্যীয় ও উত্তর আফ্রিকান গল্পও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১০ শতকে এটি রূপ লাভ করে এবং ১৪ শতকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায়। পান্ডুলিপি ভেদে গল্পের সংখ্যা ও প্রকারে ভিন্নতা রয়েছে। আরব রূপকথাগুলোকে প্রায় অণুবাদে "আরব্য রজনী" বলা হয়। ১৮ শতকে এন্টইন গালান্ড কর্তৃক অনূদিত হওয়ার পর থেকে এই গ্রন্থ পাশ্চাত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। এর অনেক প্রতিরূপ, বিশেষত ফ্রান্সে, লেখা হয়েছে। গল্পগুলোর অনেক চরিত্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক আইকন হয়ে উঠে, যেমন আলাদিন, সিনবাদ ও আলি বাবা।

মুসলিম কাব্যের অন্যতম প্রণয়াশ্রিত উদাহরণ হল লায়লা ও মজনু। এটি ইরানি, আজারবাইজানি ও অন্যান্য ফারসি, আজারবাইজানি, তুর্কি ও অন্যান্য তুর্কি ভাষার কবিদের হাতে রূপলাভ করে। এর উতপত্তিকাল ৭ম শতকে উমাইয়া আমলকে ধরা হয়। পরবর্তী সময়ের রোমিও জুলিয়েটের মত এটিও একটি ট্র্যাজিক গল্প।

আব্বাসীয় আমলে আরবি কাব্য তার শীর্ষ স্থানে পৌছায়, বিশেষত কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়া ও পারস্যীয় রাজবংশগুলোর উত্থানের আগে। নবম শতকে আবু তামাম ও আবু নুয়াসের মত লেখকরা বাগদাদের খলিফার দরবারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। অন্যদিকে আল মুতানাব্বি আঞ্চলিক দরবার থেকে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

তিনজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আল কিন্দি, আল ফারাবি ও ইবনে সিনা এরিস্টটেলিয়ানিজম ও নিওপ্লাটোনিজমকে অন্যান্য মতের সাথে সমন্বিত করেন। এর ফলে আভিসিনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম খিলাফতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিকরা ছিলেন আল জাহিজ ও আল হাসান।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে মুসলিম বিশ্ব চীনের কাছ থেকে কাগজ উৎপাদনের কৌশল গ্রহণ করে। কাগজের ব্যবহার চীন থেকে অষ্টম শতকে মুসলিম বিশ্বে ও দশম শতকে স্পেন ও বাকি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এটি নির্মাণ করা পার্চমেন্ট থেকে সহজ ছিল এবং প্যাপিরাসের মত ভেঙে যেত না। লিখিত বিবরণ ও কুরআনের কপি করার জন্য এর উপযোগীতা ছিল। লিনেন থেকে কাগজ প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া মুসলিম বিশ্ব থেকে বাকি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বারুদ তৈরীর প্রক্রিয়াও চীন থেকে মুসলিম বিশ্বের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়।

বায়ুকলের ব্যবহারের ফলে সেচ ও কৃষিতে এসময় অগ্রগতি সাধিত হয়। আন্দালুসের মাধ্যমে শস্য, বিশেষত এলমন্ড ও সাইট্রাস ইউরোপে আসত। এসময় ইউরোপীয়রা চিনি উৎপাদন ধীরে ধীরে গ্রহণ করে। নীল নদ, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস ছাড়া নৌবহনের অণুকূল বৃহৎ নদী ছিল না বিধায় সমুদ্রপথে পরিবহন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেক্সটেন্টের (কামাল বলে পরিচিত ছিল) ব্যবহারের মাধ্যমে নৌচালনাবিদ্যা উৎকর্ষতা লাভ করে। এসময়ের মানচিত্রের সাথে তুলনা করলে নাবিকরা উপকূলের কিনারা ধরে যাতায়াতের পরিবর্তে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলাচলে বেশি সক্ষম ছিলেন। ভূমধ্যসাগরে বৃহৎ তিন মাস্তুলবিশিষ্ঠ বাণিজ্যিক জাহাজ পুনরায় চালু করায় মুসলিম নাবিকদের অবদান রয়েছে। আরবি নৌকা কারিব থেকে ক্যারাভেল নামটি এসেছে বলে ধারণা করা হয়। ১৬ শতাব্দীতে পর্তুগিজদের আগমনের আগ পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে আরব বণিকরা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। এই বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল হরমুজ। ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জটিল নেটওয়ার্ক ছিল। এর মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলো একে অন্যের সাথে ও ইউরোপীয় শক্তিসমূহ যেমন ভেনিস, জেনোয়া ও কাটালোনিয়ার সাথে বাণিজ্যে অংশ নিত। সিল্ক রোড মধ্য এশিয়া পার হয়ে চীন ও ইউরোপের মধ্যবর্তী মুসলিম দেশগুলোর মধ্য দিয়ে যেত।

মুসলিম প্রকৌশলীরা শিল্পক্ষেত্রে জলশক্তিকে ব্যবহার করেন। প্রথমদিকে স্রোতশক্তি, বায়ুশক্তি ও পেট্রোলিয়াম (বিশেষত কেরোসিনে পাতনের মাধ্যমে) ব্যবহার করা হত। মুসলিম বিশ্বে পানিকল ব্যবহার সপ্তম শতকে শুরু হয়। আনুভূমিক চাকা ও উলম্ব চাকার পানিকল নবম শতকে বেশ মাত্রায় ব্যবহৃত হত। ক্রুসেডের সময় আন্দালুস ও উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্য প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি প্রদেশে এসব কলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এসব কল বেশ মাত্রায় কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। মুসলিম প্রকৌশলীরা পাম্পের মত যন্ত্রও উদ্ভাবন করেন। এসবে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ব্যবহার করা হয়। কল ও পানি উত্তোলনকারী যন্ত্রগুলোতে গিয়ারের ব্যবহার হয়। পানিকলে অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করার জন্য বাধ নির্মাণ করা হয়। এসব অগ্রগতির ফলে পূর্বে দৈহিক শ্রমে করা কাজগুলো সহজে করা সম্ভব হয়। শিল্পক্ষেত্রে জলশক্তির ব্যবহার মুসলিম বিশ্ব থেকে খ্রিষ্টান স্পেনে এসেছে এ নিয়ে আলোচনা হয় থাকে।

আরব কৃষি বিপ্লবের সময় বেশ কিছু শিল্প বিকাশ লাভ করে। এর মধ্যে রয়েছে বয়নশিল্প, দড়ি প্রস্তুত, গালিচা, রেশম ও কাগজ। রসায়ন ও যন্ত্র নির্মাণের জ্ঞানের মাধ্যমে ১২শ শতকে ল্যাটিন অণুবাদ বিস্তার লাভ করে। এযুগে কৃষি ও হস্তশিল্প উচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ইসলামি পরিচয়ের সমৃদ্ধি - আব্বাসীয়রা উমাইয়া আমলে অনারবদের প্রতি সামাজিক অসাম্যের ফলে সৃষ্ট অসন্তোষের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলেও সাম্রাজ্য দ্রুত আরব পরিচয় ধারণ করে। জ্ঞান আরবি ভাষায় সাম্রাজ্য জুড়ে আদানপ্রদান করা হত। বিভিন্ন জাতির লোকেরা তাদের দৈনন্দিক জীবনে আরবি বলা শুরু করে। অন্য ভাষা থেকে রচনা আরবিতে অণুবাদ করা হয়। এক নতুন ইসলামি পরিচয় জন্মলাভ করে যাতে পূর্ব সময়ের আরব সংস্কৃতির সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। এ সংস্কৃতি ইউরোপে বিস্ময়কর ছিল।[52]

সাম্রাজ্যের অবনতি

শিয়াদের সাথে বিবেদ- আব্বাসীয়রা শিয়াদের সাথে পাল্টা অবস্থানে ছিল। উমাইয়াদের সাথে লড়াইয়ে শিয়ারা সমর্থন দিয়েছিল। আব্বাসীয় ও শিয়া উভয়েই মুহাম্মদ (সা) এর সাথে পারিবারিক সম্পর্কের কারণে আইনগত বৈধতা দাবি করেছিল। ক্ষমতায় থাকাকালে আব্বাসীয়রা সুন্নি মতাদর্শকে ধারণ করে এবং শিয়াদের সমর্থন দান থেকে বিরত থাকে। এরপর অল্প সময় পর বার্বার খারিজিরা ৮০১ সালে উত্তর আফ্রিকায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ৫০ বছরের মধ্যে মাগরেবের ইদ্রিসি ও ইফ্রিকিয়ার আগলাবি ও এর অল্পকাল পর মিশরের ইকশিদি ও তুলিনিরা কার্যকরীভাবে আফ্রিকার স্বাধীনতা লাভ করে।

সেনাপতিদের সংঘাত- আল রাদির সময় আব্বাসীয় কর্তৃত্ব ভেঙে যেতে থাকে। এসময় তাদের তুর্কি বংশোদ্ভূত সেনাপতিরা খিলাফতকে অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেয়। এসব সেনাপতিরা কার্যত স্বাধীন ছিল। এমনকি বাগদাদের কাছের প্রদেশগুলোও আঞ্চলিক রাজবংশের শাসন দাবি করতে থাকে। এছাড়াও আব্বাসীয়দের প্রায় স্পেনের উমাইয়াদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হত।

স্বায়ত্বশায়িত রাজবংশের ভাঙ্গন- ৮ম শতাব্দীর শেষার্ধে বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী খলিফা ও তাদের উজিরদের মাধ্যমে আব্বাসীয় নেতৃত্বকে কঠোর চেষ্টা করতে হয় যাতে সাম্রাজ্যের দূর বিস্তৃতির ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সমাধান করা যায়। বিস্তৃত সাম্রাজ্য জুড়ে সীমাবদ্ধ যোগাযোগ যোগাযোগ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রশাসনিক পরিবর্তনও বিবেচনায় ছিল। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে আব্বাসীয়রা সিরিয়া ও আনাতোলিয়ায় লড়াইয়ে লিপ্ত থাকার সময় সামরিক অভিযান কম করা হত। খিলাফত অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডে বেশি মনোযোগ দিয়েছিল। আঞ্চলিক শাসনকর্তারা বেশি স্বায়ত্তশাসন লাভ করে নিজেদের অবস্থান বংশগত করে ফেলা খলিফার কাছে সমস্যার কারণ ছিল।

একই সময়ে আব্বাসীয়রা অভ্যন্তরীণ আরেকটি সমস্যার মুখোমুখি হয়। প্রাক্তন আব্বাসীয় সমর্থকরা সম্পর্কছেদ করে খোরাসানের আশেপাশে পৃথক রাজ্য স্থাপন করে। হারুনুর রশিদ বারমাকিদের হটিয়ে দেন। একই সময়কালে বেশ কিছু ভাঙন দেখা দেয়। এসবে জড়িতরা অন্যান্য ভূমির জন্য সাম্রাজ্য ত্যাগ বা সাম্রাজ্যের দূরবর্তী স্থানে অধিকার নিতে সচেষ্ট ছিল।তাজিকিস্তানের মুদ্রায় খোরাসানের আমির ইসমাইল সামানির ছবি। তিনি আব্বাসীয়দের থেকে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করেন।

[52] মুহাম্মদ রেজা ই করীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৮-৩৯৭।

৮২০ সাল নাগাদ সামানিরা মাওয়ারাননহর ও বৃহত্তর খোরাসানে স্বাধীন কর্তৃত্ব অর্জন করে। শিয়া হামদানিরা উত্তর সিরিয়ায় এবং ইরানের তাহিরি ও সাফারি রাজবংশের উত্তরসুরি হয়। বিশেষত সামারার নৈরাজ্যের পর আব্বাসীয় কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে প্রদেশগুলোতে কেন্দ্রবিমুখী প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ১০ম শতাব্দীর প্রথম নাগাদ আব্বাসীয়রা ইরাকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তা বিভিন্ন আমিরদের হাতে চলে যায়। খলিফা আল রাদি আমিরুল উমারা পদ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা মেনে নিতে বাধ্য হন। এর অল্পকাল পর দায়লাম থেকে বুইয়িরা উত্থান লাভ করে এবং বাগদাদের আমলাতন্ত্রে স্থান করে নেয়। ইবনে মিশকায়িয়ার মতানুযায়ী তারা তাদের সমর্থকদের ইকতা (কর খামার গঠনের জন্য জায়গির) বণ্টন করতে থাকে।

অষ্টম শতকের শেষ নাগাদ আব্বাসীয়রা যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা হারায়। ৭৯৩ সালে ইদ্রিসি রাজবংশ ফেজ থেকে মরক্কো পর্যন্ত একটি রাষ্ট্র স্থাপন করে। একই সময় আব্বাসীয় গভর্নরদের একটি পরিবারের ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং ৮৩০ এর দশকে তারা আগলাবি আমিরাত স্থাপন করে। ৮৬০ এর দশক নাগাদ মিশরের গভর্নররা তাদের নিজস্ব তুলুনি আমিরাত গঠন করে। প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ ইবনে তুলুনের নামে এর নাম করণ করা হয়। এরপর থেকে মিশর খলিফা থেকে পৃথক হয়ে রাজবংশের হাতে শাসিত হতে থাকে। পূর্বাঞ্চলেও গভর্নররা কেন্দ্র থেকে নিজেদের পৃথক করে নেয়। হেরাতের সাফারি ও বুখারার সামানিরা ৮৭০ এর দশকে সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং পারস্যায়িত সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র গড়ে তোলে। এসময় শুধু মেসোপটেমিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চল সরাসরি আব্বাসীয় নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফিলিস্তিন ও হেজাজ প্রায় তুলুনিরা নিয়ন্ত্রণ করত। আনাতোলিয়ায় বাইজেন্টাইনরা আরব মুসলিমদের আরও পূর্বদিকে ঠেলে দেয়।

৯২০ এর দশক নাগাদ অবস্থা আরো বদলে যায়। প্রথম পাঁচ ইমামকে মান্য করা শিয়াদের একটি গোষ্ঠী যারা মুহাম্মদ (সা) এর কন্যা ফাতিমার সাথে নিজেদের রক্তসম্পর্ক দাবি করত তারা ইদ্রিসি ও আগলাবিদের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এই নতুন রাজবংশ ফাতেমীয় নামে পরিচিত হয়। ৯৬৯ সালে তারা মিশরের দিকে অগ্রসর হয় এবং মিশরের ফুসতাতে রাজধানী স্থাপন করে। একে তারা শিয়া শিক্ষা ও রাজনীতির মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে। ১০০০ সাল নাগাদ ফাতেমীয়রা সুন্নিদের আব্বাসীয়দের কাছে একটি আদর্শগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। এসময় আব্বাসীয় শাসন বেশ কিছু গভর্নরদের মধ্যে বিভক্ত ছিল এবং বাগদাদের খলিফার কর্তৃত্ব আগের মত শক্ত ছিল না। এসকল শাসনকর্তারা নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকতেন। খলিফা নিজে বুইয়ি আমিরের নিরাপত্তায় ছিলেন। বুইয়ি আমির সমগ্র ইরাক ও পশ্চিম ইরানের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।

ইরাকের বাইরের স্বাধীন প্রদেশগুলো ধীরে ধীরে বংশগত শাসকদের আওতায় চলে আসে। এসব স্থানে খলিফার অবস্থান ছিল আনুষ্ঠানিক। মাহমুদ গজনভি বহুল প্রচলিত "আমির" পদবীর স্থলে "সুলতান" পদবী ধারণ করেন। ১১ শতকে খলিফার অবস্থান আরো হ্রাস পায় যখন কিছু মুসলিম শাসক জুমার খুতবায় তার নাম উল্লেখ করার প্রথা থেকে সরে আসেন ও নিজেদের নামে মুদ্রা জারি করেন।

কায়রোর ফাতেমীয়রা মুসলিম বিশ্বের কর্তৃত্বের ব্যাপারে আব্বাসীয়দের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। বাগদাদ আব্বাসীয় খলিফাদের কেন্দ্র হলেও সেখানকার শিয়াদের মধ্যে ফাতেমীয়রা কিছু সমর্থন লাভ করে। ফাতেমীয়দের

পতাকা ছিল সবুজ ও আব্বাসীয়দের পতাকা ছিল কালো। ফাতেমীয়দের সাথে এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা ১২ শতকে সমাপ্তি ঘটে।53

মঙ্গোল আক্রমণ (১২০৬-১২৫৮)- ১২০৬ সালে চেঙ্গিস খান মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলদের মধ্যে শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন। ১৩ শতাব্দীতে এই মঙ্গোল সাম্রাজ্য অধিকাংশ ইউরেশিয়ান অঞ্চল জয় করে ফেলে। ১২৫৮ সালে হালাকু খানের বাগদাদ ধ্বংস করার ঘটনা ইসলামি স্বর্ণযুগের সমাপ্তি হিসেবে দেখা হয়। মঙ্গোলদের আশঙ্কা ছিল যে মুহাম্মদ (সা) এর চাচার বংশধর আল মুসতাসিমকে হত্যা করা হলে অলৌকিক দুর্যোগ হানা দেবে। পারস্যের শিয়ারা বলে যে শিয়া ইমাম হুসাইন বিন আলির মৃত্যুর পর এমন কোনো দুর্যোগ হয়নি। রাজকীয় রক্ত না ঝরানোর মঙ্গোল রীতি তাই অগুরুত্বপূর্ণ ঠেকে। হালাকু খান ১২৫৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি আল মুসতাসিমকে কার্পেটে মুড়ে ঘোড়ার সাহায্যে পদদলিত করে হত্যা করেন। খলিফার পরিবারকেও হত্যা করা হয়। তার কনিষ্ঠ পুত্রকে বাচিয়ে রাখা হয় ও মঙ্গোলিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এক কন্যাকে হালাকু খানের হারেমে দাসি হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গোলিয়ান ইতিহাসবিদদের মতে বেঁচে যাওয়া পুত্রটি বিয়ে করে ও তার সন্তানসন্ততি হয়।54

কায়রোর আব্বাসীয় খিলাফত (১২৬১-১৫১৭) - নবম শতাব্দীতে আব্বাসীয়রা খলিফার প্রতি অনুগত সেনাবাহিনী গঠন করে। এতে অনারবদের থেকে লোক নেয়া হয়েছিল যাদের মামলুক বলা হত। আল মামুন ও তার ভাই আল মুতাসিমের শাসনকালে গঠিত এই সেনাবাহিনী সাম্রাজ্যের পরবর্তী ভাঙন রোধ করে। প্রথমদিকে এরা সরকারকে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা বিষয়ে সাহায্য করত। আল মুতাসিম কর্তৃক বাগদাদ থেকে সামারায় রাজধানী স্থানান্তর খিলাফতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে। অধিকন্তু আল রাদি মুহাম্মদ বিন রাইকের হাতে অধিকাংশ রাজকীয় কর্ম তুলে দেয়ার আগ পর্যন্ত মামলুকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি থাকে।

মামলুকরা মিশরের ক্ষমতায় চলে আসে। মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদের পতনের পর ১২৬১ সালে মামলুকরা কায়রোতে আব্বাসীয় খিলাফত পুনপ্রতিষ্ঠা করে। কায়রোর প্রথম আব্বাসীয় খলিফা ছিলেন আল মুসতানসির। তৃতীয় আল মুতাওয়াক্কিলের সময় পর্যন্ত কায়রোর আব্বাসীয় খিলাফত টিকে ছিল। প্রথম সেলিম তাকে কনস্টান্টিনোপলে বন্দী হিসেবে নিয়ে যান। কায়রো ফিরে আসার পর ১৫৪৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 55

১২৫৮ সালে বাগদাদের পতনের পর আব্বাসীয় রাজবংশের কিছু বেঁচে যাওয়া সদস্য তাদের জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় ইসমাইল বিন হামজা বিন আহমেদ বিন মুহাম্মদের নেতৃত্ব দক্ষিণ পারস্যের ফারস অঞ্চলে চলে যায়। তারা খোনজ শহরে অবস্থান নেয়। এটি এসময় জ্ঞান অর্জনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। শেখ আবদুস সালাম খোনজি বিন আব্বাস বিন দ্বিতীয় ইসমাইল বাগদাদের পতনের পাঁচ বছর পর খোনজে জন্ম লাভ করেন। তিনি একজন বড় ধর্মীয় পন্ডিত ও সুফি হন। স্থানীয় জনতা তাকে শ্রদ্ধা করত। তার মাজার খোনজে রয়েছে।

53 Ralph W Brauer , Boundaries and Frontiers in Medieval Muslim Geography, Diane, p. 7–10.
54 খালিদ ফাহাদ, "মঙ্গোল আগ্রাসন এবং বাগদাদ ধ্বংসযজ্ঞ", ইসলামের হারানো ইতিহাস, ১০/০২/২০১৮ইং, https://lostislamichistorybangla.wordpress.com।
55 Alexander। Mikaberidze "The Georgian Mameluks in Egypt", http://www.napoleon-series.org/.

শেখ আবদুস সালামের বংশধররা ধর্মীয় পন্ডিত ছিলেন এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে সম্মানিত হতেন। তেমন একজন শেখ মুহাম্মদ (মৃত্যু আনুমানিক ৯০৫ হিজরি) বাসতাক চলে আসেন। তার নাতি শেখ মুহাম্মদ বিন শেখ নাসিরউদ্দিন আহমেদ বিন শেখ মুহাম্মদ খোনজে কিছু সময়ের জন্য বসতি করেছিলেন। কিন্তু ৯৩৮ হিজরি বর্ধমান সাফাভি শক্তির কারণে তিনি স্থায়ীভাবে তার দাদার মত বাসতাকে চলে আসেন। তার নিজের নাতি শেখ হাসান (মৃত্যু ১০৮৪ হিজরি) (মোল্লা হাসান বলেও পরিচিত) বাসতাকের আব্বাসীয়দের সাধারণ বংশধর।

শেখ হাসানের নাতি শেখ মুহাম্মদ সাইদ (জন্ম ১০৯৬ হিজরি-মৃত্যু ১১৫২ হিজরি) ও শেখ মুহাম্মদ খান (জন্ম ১১১৩ হিজরি-মৃত্যু ১১৯৭ হিজরি) এই অঞ্চলের প্রথম আব্বাসীয় শাসক। ১১৩৭ হিজরি শেখ মুহাম্মদদ সাইদ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সমর্থন জড়ো করতে থাকেন। লার দখলের পর তিনি মৃত্যুর ১১৫২ হিজরিতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ১২ বা ১৪ বছর এই শহর ও এর উপর নির্ভরশীল অঞ্চলগুলো শাসন করতেন।

তার ভাই শেখ মুহাম্মদ খান বাসতাকি এরপর বাসতাক ও জাহানগিরিয়া অঞ্চলের শাসক হন। ১১৬১ হিজরিতে শেখ মুহাম্মদ খান বাসতাকি দিদেহবান দুর্গের উদ্দেশ্যে বের হন এবং বাস্তাক ও এর অঞ্চলসমূহ তার বড় ভাইয়ের পুত্র শেখ মুহাম্মদ সাদিক ও তার চাচাত ভাই আগা হাসান খানের হাতে অর্পণ করেন। শেখ মুহাম্মদ খান প্রায় ২০ থেকে ২৪ বছর দিদেহবান দুর্গ থেকে জাহানগিরিয়া শাসন করেন। একারণে তাকে শেখ মুহাম্মদ "দিদেহবান" বলা হয়। এরপর তিনি বাসতাক ফিরে আসেন এবং আমৃত্যু সেখান থেকে শাসন করে যান। তার শাসনের সর্বোচ্চ সীমায় বাসতাক খানাতে শুধু জাহানগিরিয়া ছাড়াও লার ও বন্দর আব্বাস ও এসবের উপর নির্ভরশীল এলাকাগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শেখ মুহাম্মদ খান বাসতাকি ‘‘খান’’ উপাধিধারী বাসতাকের প্রথম আব্বাসীয় শাসক। এরপর সকল আব্বাসীয় শাসকের ক্ষেত্রে ‘‘খান’’ উপাধিটি ব্যবহার হতে থাকে।

বাসতাক ও জাহানগিরিয়ার সর্বশেষ আব্বাসীয় শাসক ছিলেন মুহাম্মদ আজম খান বনিআব্বাসিয়ান। তিনি তারিখে জাহানগিরিয়া ওয়া বনিআব্বাসিয়ানে বাসতাক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে এই অঞ্চলের ইতিহাস ও এর শাসনকর্তা আব্বাসীয় পরিবারের বর্ণনা রয়েছে। মুহাম্মদ আজম খান বনিআব্বাসিয়ান ১৯৬৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরকে বাসতাকের আব্বাসীয় শাসনের সমাপ্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

আব্বাসীয় খলিফাদের তালিকাঃ [56]

আব্বাসীয় খিলাফতের খলিফা-

১	আস সাফাহ	১৩১–১৩৬ হি.	৭৫০–৭৫৪ খ্রি.
২	আল মনসুর	১৩৬–১৫৮	৭৫৪–৭৭৫

56 মুহাম্মদ রেজা ই করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮- ২৫৭।

৩	আল মাহদি	১৫৮–১৬৯	৭৭৫–৭৮৫
৪	আল হাদি	১৬৯–১৭০	৭৮৫–৭৮৬
৫	হারুনুর রশিদ	১৭০–১৯৩	৭৮৬–৮০৯
৬	আল আমিন	১৯৩–১৯৮	৮০৯–৮১৩
৭	আল মামুন	১৯৮–২১৮	৮১৩–৮৩৩
৮	আল মুতাসিম	২১৮–২২৭	৮৩৩–৮৪২
৯	আল ওয়াসিক	২২৭–২৩২	৮৪২–৮৪৭
১০	আল মুতাওয়াক্কিল	২৩২–২৪৭	৮৪৭–৮৬১
১১	আল মুনতাসির	২৪৭–২৪৮	৮৬১–৮৬২
১২	আল মুসতাইন	২৪৮–২৫২	৮৬২–৮৬৬
১৩	আল মুতাজ	২৫২–২৫৫	৮৬৬–৮৬৯
১৪	আল মুহতাদি	২৫৫–২৫৬	৮৬৯–৮৭০
১৫	আল মুতামিদ	২৫৭–২৭৯	৮৭০–৮৯২
১৬	আল মুতাদিদ	২৭৯–২৮৯	৮৯২–৯০২
১৭	আল মুকতাফি	২৮৯–২৯৫	৯০২–৯০৮
১৮	আল মুকতাদির	২৯৫–৩২০	৯০৮–৯৩২
১৯	আল কাহির	৩২০–৩২২	৯৩২–৯৩৪
২০	আল রাদি	৩২২–৩২৯	৯৩৪–৯৪০
২১	আল মুত্তাকি	৩২৯–৩৩৪	৯৪০–৯৪৪
২২	আল মুসতাকফি	৩৩৪–৩৩৬	৯৪৪–৯৪৬

২৩	আল মুতি	৩৩৬–৩৬৩	৯৪৬–৯৭৪
২৪	আল তাই	৩৬৩–৩৮১	৯৭৪–৯৯১
২৫	আল কাদির	৩৮২–৪২২	৯৯১–১০৩১
২৬	আল কাইম	৪২২–৪৬৮	১০৩১–১০৭৫
২৭	আল মুকতাদি	৪৬৮–৪৮৭	১০৭৫–১০৯৪
২৮	আল মুসতাজির	৪৮৭–৫১২	১০৯৪–১১১৮
২৯	আল মুসতারশিদ	৫১২-৫৩০	১১১৮–১১৩৫
৩০	আর রশিদ	৫৩০–৫৩১	১১৩৫–১১৩৬
৩১	আল মুকতাফি	৫৩১–৫৫৫	১১৩৬–১১৬০
৩২	আল মুসতানজিদ	৫৫৫–৫৬৬	১১৬০–১১৭০
৩৩	আল মুসতাদি	৫৬৬–৫৭৬	১১৭০–১১৮০
৩৪	আন নাসির	৫৭৬–৬২২	১১৮০–১২২৫
৩৫	আজ জহির	৬২২–৬২৩	১২২৫–১২২৬
৩৬	আল মুসতানসির	৬২৩–৬৪০	১২২৬–১২৪২
৩৭	আল মুসতাসিম	৬৪০–৬৫৬	১২৪২–১২৫৮

কায়রোর খলিফা-

৩৯	দ্বিতীয় আল মুসতানসির	৬৫৯–৬৬০ হি.	১২৬১–১২৬২ খ্রি.
৪০	প্রথম আল হাকিম	৬৬০–৭০২	১২৬২–১৩০২
৪১	প্রথম আল মুসতাকফি	৭০২–৭৪১	১৩০৩–১৩৪০
৪২	প্রথম আল ওয়াসিক	৭৪১–৭৪২	১৩৪০–১৩৪১

৪৩ দ্বিতীয় আল হাকিম ৭৪২–৭৫৩ ১৩৪১–১৩৫২

৪৪ প্রথম আল মুতাদিদ ৭৫৩–৭৬৪ ১৩৫২–১৩৬২

৪৫ প্রথম আল মুতাওয়াক্কিল ৭৬৪–৭৮৫ ১৩৬২–১৩৮৩

৪৬ দ্বিতীয় আল ওয়াসিক ৭৮৫–৭৮৮ ১৩৮৩–১৩৮৬

৪৭ আল মুতাসিম ৭৮৮–৭৯১ ১৩৮৬–১৩৮৯

৪৮ প্রথম আল মুতাওয়াক্কিল (পুনরায় ক্ষমতালাভ) ৭৯১–৮০৯ ১৩৮৯–১৪০৬

৪৯ আল মুসতাইন ৮০৯–৮১৭ ১৪০৬–১৪১৪

৫০ দ্বিতীয় আল মুতাদিদ ৮১৭–৮৪৫ ১৪১৪–১৪৪১

৫১ দ্বিতীয় আল মুসতাকফি ৮৪৫–৮৫৫ ১৪৪১–১৪৫১

৫২ আল কাইম ৮৫৫–৮৫৯ ১৪৫১–১৪৫৫

৫৩ আল মুসতানজিদ৮৫৯-৮৮৪ ১৪৫৫–১৪৭৯

৫৪ দ্বিতীয় আল মুতাওয়াক্কিল ৮৮৪–৯০২ ১৪৭৯–১৪৯৭

৫৫ আল মুসতামসিক৯০২–৯১৪ ১৪৯৭–১৫০৮

৫৬ তৃতীয় আল মুতাওয়াক্কিল ৯১৪–৯২৩ ১৫০৮–১৫১৭

উসমানী খিলাফত (১৫১৭ খ্রি.-১৯২৪খ্রি.)

১২৯৯ সালে অঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত প্রথম উসমান উত্তরপশ্চিম আনাতোলিয়ার দ্বায়িত্ব পান সেলযুক সাম্রাজ্য কর্তৃক। প্রথম দিকে সেলযুক সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত থাকলেও সেলজুক সাম্রাজ্যের ক্রান্তিলগ্নে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এবং ধীরে ধীরে একটি বৃহত সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেলজুক রাজবংশের জামাতাও ছিলেন[57] এবং প্রথম উসমানের মাতা হালিমে সুলতান ছিলেন সেলজুক শাহজাদা নুমান এর মেয়ে অর্থাৎ আর্তুগুলের স্ত্রী প্রথম মুরাদ কর্তৃক বলকান জয়ের মাধ্যমে উসমানীয় সাম্রাজ্য বহুমহাদেশীয় সাম্রাজ্য হয়ে উঠে এবং খিলাফতের দাবিদার হয়।

[57] Stanford Jay Shaw, Malcolm Edward Yapp “Ottoman Empire” Britannica Online Encyclopedia, Nov 15, 2018, www.britannica.com.

১৪৫৩ সালে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের কনস্টান্টিনোপল জয় করার মাধ্যমে উসমানীয়রা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করে।[58]

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে বিশেষত সুলতান প্রথম সুলাইমানের সময় উসমানীয় সাম্রাজ্য দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, ককেসাস, উত্তর আফ্রিকা ও হর্ন অব আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত একটি শক্তিশালী বহুজাতিক, বহুভাষিক সাম্রাজ্য ছিল। ১৭শ শতাব্দীর শুরুতে সাম্রাজ্যে ৩৬টি প্রদেশ ও বেশ কয়েকটি অনুগত রাজ্য ছিল। এসবের কিছু পরে সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত করে নেয়া হয় এবং বাকিগুলোকে কিছুমাত্রায় স্বায়ত্ত্বশাসন দেয়া হয়।

উসমানীয় সাম্রাজ্য সুদীর্ঘ ছয়শত বছরেরও বেশী ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। তবে দীর্ঘদিনব্যাপী ইউরোপীয়দের তুলনায় সামরিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। ধারাবাহিক অবনতির ফলে সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর আনাতোলিয়ায় নতুন প্রজাতন্ত্র হিসেবে আধুনিক তুরস্কের উদ্ভব হয়। বলকান ও মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যের সাবেক অংশগুলো প্রায় ৪২টি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[59]

সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম উসমানের নাম থেকে উসমানীয় বা অটোমান নামটি এসেছে। একইভাবে রাজবংশকে উসমানীয় রাজবংশ বা অটোমান রাজবংশ বলা হয়। তুর্কি ভাষায় সাম্রাজ্যকে বলা হত দেভলেতি আলিয়া উসমানিয়া বা উসমানলি দেভলেতি বলা হত। আধুনিক তুর্কি ভাষায় উসমানলি ইম্পারাতুরলুগু বা উসমানলি দেভলেতি বলা হয়।

পাশ্চাত্যে "উসমানীয় সাম্রাজ্য" ও "টার্কি" তথা তুরস্ক নাম দুইটির একটি অন্যটির বদলে ব্যবহার হত। আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে "টার্কি" শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। প্রজাতন্ত্র গঠিত হওয়ার পর আঙ্কারা ভিত্তিক নতুন সরকার টার্কি শব্দকে সরকারি নাম হিসেবে ব্যবহার শুরু করলে এই দ্বৈতপ্রথার অবসান হয়।

প্রথম সুলাইমানের বাবা এরতুগরুল গাজি বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে সেলজুকদের সাহায্য করার জন্য ৪০০ ঘোড়সওয়ার নিয়ে মার্ভ থেকে আনাতোলিয়া আসেন। তুর্কি বংশোদ্ভূত সেলজুক রুম সালতানাতের পতনের পর আনাতোলিয়া বেশ কিছু স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে যাদেরকে গাজি আমিরাত বলা হত। এর মধ্যে একটি আমিরাত প্রথম উসমানের অধীন ছিল। তার নাম থেকে উসমানীয় নামটি এসেছে। তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রান্ত পর্যন্ত সীমানা বিস্তৃত করেন। মধ্যযুগের আনাতোলিয়ার ইতিহাস কম জানা যাওয়ায় উসমানীয়রা কিভাবে প্রতিবেশি রাজ্যগুলোকে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

প্রথম উসমানের মৃত্যুর পর উসমানীয় শাসন ভূমধ্যসাগরের পূর্বপ্রান্ত এবং বলকান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। উসমানের ছেলে প্রথম ওরহান ১৩২৪ সালে বুরসা জয় করেন এবং একে উসমানীয়দের নতুন রাজধানী করা হয়। বুরসার পতনের ফলে বাইজেন্টাইনরা উত্তরপশ্চিম আনাতোলিয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারায়। ১৩৮৭ সালে ভেনিসিয়ানদের কাছ থেকে সেলোনিকা জয় করে নেয়া হয়। ১৩৮৯ সালে কসোভো জয় করার পর অত্র অঞ্চলে সার্বিয়ান শক্তির সমাপ্তি ঘটে

58 Selcuk Aksin Somel ,The A to Z of the Ottoman Empire, p.179.
59 Mikhail Alan, Nature and Empire in Ottoman Egypt, Cambridge University Press, p. 7.

ফলে ইউরোপের দিকে উসমানীয়দের অগ্রযাত্রা সহজ হয়। ১৩৯৬ সালে নিকোপোলিসের যুদ্ধকে মধ্যযুগের শেষ ব্যাপকভিত্তিক ক্রুসেড হিসেবে দেখা হয়। এই যুদ্ধে উসমানীয়রা জয়ী হয়েছিল।[60]

বলকানে তুর্কিদের অগ্রযাত্রার সাথে কনস্টান্টিনোপল জয় করা কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। কনস্টান্টিনোপলের চতুর্পাশ্বের সকল এলাকা এসময় উসমানীয়রা নিয়ন্ত্রণ করত। তুর্কি-মঙ্গোলিয়ান সুলতান তৈমুর আনাতোলিয়া আক্রমণ করলে বাইজেন্টাইনরা সাময়িকভাবে উসমানীয়দের হাত থেকে রেহাই পায়। ১৪০২ সালে আঙ্কারার যুদ্ধে পৃথিবীর শাসক তৈমুর লং উসমানীয়দের পরাজিত করেন এবং সুলতান প্রথম বায়েজিদকে বন্দী করা হয়। ফলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বায়েজিদের সন্তানরা উত্তরাধিকার দাবি করলে ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট গৃহযুদ্ধ ১৪০২ থেকে ১৪১৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শেষপর্যন্ত প্রথম মুহাম্মদ সুলতান হন এবং উসমানীয়দের ক্ষমতা পুনপ্রতিষ্ঠিত করেন।[61]

১৪০২ সালে বলকানে কিছু এলাকা যেমন সেলোনিকা, মেসিডোনিয়া ও কসোভো উসমানীয়দের হাতছাড়া হয়। তবে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ১৪৩০ এর দশক থেকে ১৪৫০ এর দশকের মধ্যে তা পুনরুদ্ধার করেন। ১৪৪৪ সালের ১০ নভেম্বর তিনি পোল্যান্ডের তৃতীয় লাডিস্লো ও জন হানয়াডির অধীন হাঙ্গেরিয়ান, পোলিশ ও ওয়ালিচিয়ান বাহিনীকে ভারনার যুদ্ধে পরাজিত করেন। এটি ভারনার ক্রুসেডের শেষ যুদ্ধ। তবে আলবেনীয়রা স্কেনডারবার্গের অধীনে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। চার বছর পর, তুর্কিদের উপর আক্রমণ করার জন্য জন হানয়াডি হাঙ্গেরিয়ান ও ওয়ালাচিয়ানদের আরেকটি বাহিনী প্রস্তুত করেন তবে ১৪৪৮ সালে কসোভোর দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন।

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সর্বোচ্চ পর্যায়

১৫৩৮ সালে প্রিভেজার যুদ্ধে বারবারোসা হায়রেদ্দিন পাশা পঞ্চম চার্লসের হলি লীগকে পরাজিত করেছেন। দ্বিতীয় মুরাদের ছেলে দ্বিতীয় মুহাম্মদ রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করেন। ১৪৫৩ সালের ২৯ মে দ্বিতীয় মুহাম্মদ কনস্টন্টিনোপল জয় করেন। উসমানীয়দের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চকে তার কার্যক্রম চালু রাখার অনুমতি দেয়া হয়।[62] পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলোর সাথে বাইজেন্টাইনদের সম্পর্ক খারাপ ছিল বিধায় অধিকাংশ অর্থোডক্স জনগণ ভেনেসিয়ানদের পরিবর্তে উসমানীয়দের অধীনে থাকাকে সুবিধাজনক মনে করে। ইতালীয় উপদ্বীপে বাইজেন্টাইনদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা ছিল আলবেনিয়ানদের প্রতিরোধ।

১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে উসমানীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃতির যুগে প্রবেশ করে। নিবেদিত ও দক্ষ সুলতানদের শাসনের ধারাবাহিকতায় সাম্রাজ্য সমৃদ্ধি লাভ করে। ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য রুটের বিস্তৃত অংশ নিয়ন্ত্রণ করার কারণে সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করে।

সুলতান প্রথম সেলিম পারস্যের সাফাভি সম্রাট প্রথম ইসমাইলকে পরাজিত করে দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন। তিনি মিশরে উসমানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা ও লোহিত সাগরে নৌবাহিনী মোতায়েন করেছিলেন।

60 Robert Elsie, Dictionary of Kosova, Historica, Scarecrow Press, p. 95–96.
61 Gábor Ágoston; Bruce Alan Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, Infobase Publishing, p. 363.
62 Mark Erickson, Ljubica Erickson, Russia War, Peace And Diplomacy: Essays in Honour of John Erickson, p. 94.

উসমানীয়দের এই সম্প্রসারণের পর পর্তুগিজ সাম্রাজ্য ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে এই অঞ্চলের প্রধান পক্ষ হওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

সুলতান প্রথম সুলাইমান ১৫২১ সালে বেলগ্রেড জয় করেন এবং উসমানীয়-হাঙ্গেরিয়ান যুদ্ধের এক পর্যায়ে হাঙ্গেরি রাজ্যের দক্ষিণ ও মধ্য অংশ জয় করে নেয়া হয়। মোহাচের যুদ্ধে জয়ের পর তিনি বর্তমান হাঙ্গেরির পশ্চিম অংশ ও মধ্য ইউরোপীয় অঞ্চল ছাড়া বাকি অংশে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৫২৯ সালে তিনি ভিয়েনা অবরোধ করেন তবে শহর জয় করতে ব্যর্থ হন। ১৫৩২ সালে তিনি পুনরায় ভিয়েনা আক্রমণ করেন তবে গুনসের অবরোধের পর তিনি ব্যর্থ হন। ট্রান্সিলভানিয়া, ওয়ালাচিয়া ও মলডোভিয়া উসমানীয়দের অনুগত রাজ্যে পরিণত হয়।। পূর্বে দিকে উসমানীয়রা পারস্যের কাছ থেকে বাগদাদ দখল করে নেয়। ফলে মেসোপটেমিয়া ও পারস্য উপসাগরে নৌ চলাচলের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আসে।

উসমানীয় সাম্রাজ্য ও ফ্রান্স হাবসবার্গ শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং শক্তিশালী মিত্রে পরিণত হয়। ফরাসি ও উসমানীয়রা যৌথ প্রচেষ্টায় ১৫৪৩ সালে নাইস ও ১৫৫৩ সালে করসিকা জয় করে নেয়।[63] নাইস অবরোধের এক মাস আগে এজতেরুগুম জয়ের সময় ফ্রান্স উসমানীয়দেরকে গোলন্দাজ ইউনিট দিয়ে সহায়তা করেছিল। উসমানীয়রা আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার পর হাবসবার্গ শাসক ফার্ডিনেন্ড ১৫৪৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উসমানীয়দের বশ্যতা স্বীকার করে নেন।

১৫৫৯ সালে প্রথম আজুরাম পর্তুগিজ যুদ্ধের পর উসমানীয় সাম্রাজ্য দুর্বল আদাল সালতানাতকে সাম্রাজ্যের অংশ করে নেয়। এই সম্প্রসারণ সোমালিয়া ও হর্ন অব আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পর্তুগিজদের সাথে প্রতিযোগীতার জন্য ভারত মহাসাগরে প্রভাব বাড়ানো হয়।

প্রথম সুলাইমানের শাসনের সমাপ্ত হওয়ার সময় সাম্রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫, ০০০, ০০০ এবং তিন মহাদেশব্যপী সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। উপরন্তু সাম্রাজ্য একটি শক্তিশালী নৌ শক্তি হয়ে উঠে। ভূমধ্যসাগরের অধিকাংশ এলাকা উসমানীয়রা নিয়ন্ত্রণ করত। এই সময় নাগাদ উসমানীয় সাম্রাজ্য ইউরোপের রাজনৈতিক পরিমন্ডলের বৃহৎ অংশ হয়ে উঠে। উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব রোমান সাম্রাজ্যের সাথে তুলনা করা হয়।[64]

অনগ্রসরতা ও সংস্কার (১৫৬৬-১৮২৭)

সাম্রাজ্যের অনগ্রসরতা ও অবনতি বিষয়ে স্টিফেন লি বলেন যে ১৫৬৬ সালের পর থেকে তা বিরতিহীনভাবে চলছিল যার মাঝে কিছু সংস্কার ও পুনরুদ্ধার কার্য সম্পাদন হয়। অনেকের মতে সুলতানের অযোগ্য উজিরে আজম, দুর্বল ও অপ্রতুল অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী, দুর্নীতি পরায়ণ অফিসার, লোভী শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক মিত্রদের কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। লির মতে ১২৯২ থেকে ১৫৬৬ পর্যন্ত একজন বাদে সবাই যোগ্য শাসক ছিলেন এবং ১৫৬৬ থেকে ১৭০৩ এর ১৩জন সুলতানের মধ্যে দুইজন বাদে বাকিরা দক্ষ ছিলেন না। কেন্দ্রীভূত সরকার ব্যবস্থায়

[63] Imber Colin, The Ottoman Empire, 1300–1650: The Structure of Power, p. 53.
[64] ডক্টর শেখ লুৎফর রহমান, উসমানীয়া সালাতানাত, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯১খ্রি.), পৃ. ৯৮- ১০৬।

www.nagorikpathagar.org

কেন্দ্রের দুর্বলতা ক্ষতির কারণ ছিল। এর ফলে প্রাদেশিক অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ধীরে ধীরে কনস্টান্টিনোপলের শাসনকে উপেক্ষা করতে থাকে। দ্বিতীয়ত ইউরোপীয় শত্রুদের সামরিক সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু সে তুলনায় উসমানীয়দের সেনাবাহিনীতে অগ্রগতি হয়নি। শেষপর্যায়ে যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি, বিশ্ববাণিজ্য অন্যদিকে মোড় নেয়া ইত্যাদি কারণে উসমানীয় অর্থনীতি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।65

অবনতি ও আধুনিকায়ন (১৮২৮-১৯০৮)

দলমাবাচ প্রাসাদে প্রথম উসমানীয় সংসদ উদ্বোধন, ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ। প্রথম সাংবিধানিক যুগ শুধু দুই বছর স্থায়ী ছিল। তানজিমাত যুগে ধারাবাহিক সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে যোগদান, ব্যাংকিং প্রক্রিয়া সংস্কার, সেকুলার আইনের প্রবর্তন ও আধুনিক কারখানার প্রবর্তন করা হয়। ১৮৪০ সালের ২৩ অক্টোবর উসমানীয় ডাক মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়।

স্যামুয়েল মোর্স ১৮৪৭ সালে সুলতান প্রথম আবদুল মজিদের কাছ থেকে টেলিগ্রাফ নিয়ে প্যাটেন্ট লাভ করেন। সুলতান এই নতুন আবিষ্কার ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করেছিলেন।66 এই সফল পরীক্ষার পর তুরস্কে প্রথমবারের মত ইস্তানবুল-এডির্ন-শুমনু লাইনে টেলিগ্রাফ স্থাপন করা হয়। ১৮৪৭ সালের ৯ আগস্ট এর কার্যক্রম শুরু হয়।67 সংস্কারকালীন সময়ে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এই প্রথম সংবিধান স্বল্পস্থায়ী ছিল। সংসদ চালু থাকার দুই বছর পর সুলতান তা স্থগিত করেন।

সাম্রাজ্যের খ্রিষ্টান নাগরিকরা উচ্চশিক্ষায় মুসলিমদের চেয়ে অগ্রসর হয়ে যায়। ১৮৬১ সালে উসমানীয় খ্রিষ্টানদের জন্য ৫৭১টি প্রাথমিক ও ৯৪টি মাধ্যমিক স্কুল ছিল যার মোট শিক্ষার্থী ছিল ১, ৪০, ০০০ জন যা সেসময়ে স্কুলে পড়া মুসলিম শিক্ষার্থীদের চেয়ে অনেক বেশি। মুসলিম শিক্ষার্থীরা মূলত আরবি ও ইসলাম বিষয়ে পড়াশোনা করত। ১৯১১ সালে ইস্তানবুলের ৬৫৪টি পাইকারি কোম্পানির মধ্যে ৫২৮টির মালিক ছিল জাতিগত গ্রীকরা।68

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ছিল দুর্বল হয়ে পড়া উসমানীয় সাম্রাজ্যের অঞ্চলগুলোর উপর প্রভাব নিয়ে প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যকার লড়াই। যুদ্ধের আর্থিক বোঝা সাম্রাজ্যকে ৫ মিলিয়ন (৫০ লক্ষ) পাউন্ডের বৈদেশিক ঋণ নিতে বাধ্য করে।69 এই যুদ্ধের ফলে ক্রিমিয়ান তাতাররা দেশত্যাগে বাধ্য হয়, প্রায় ২, ০০, ০০০ তাতার এসময় উসমানীয় সাম্রাজ্যে চলে আসে। ককেসিয়ান যুদ্ধের শেষ নাগাদ ৯০% সিরকাসিয়ান জাতিগত হত্যার শিকার হয় এবং ককেসাসে তাদের আবাসভূমি থেকে উৎখাত হয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যে চলে আসে যার ফলে তুরস্কে

65 প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

66 "Beylerbeyi Palace", Istanbul City Guide, https://web.archive.org/web/20071010112702/http://www.istanbulcityguide.com/history/body_mansions_palaces.htm.

67 "History", Türk Telekomh , ttps://web.archive.org/web/20070928164731/http://www.turktelekom.com.tr/webtech/eng_default.asp?sayfa_id=30.

68 Mark Erickson, Ljubica Erickson, Russia War, Peace And Diplomacy: Essays in Honour of John Erickson, Weidenfeld & Nicolson, p. 95.

69 Douglas Arthur Howard, The History of Turkey, Greenwood Publishing Group, p. 71.

৫, ০০, ০০০ থেকে ৭, ০০, ০০০ সিরকাসিয়ান বসতি স্থাপন করে। কিছু সিরকাসিয়ান সংগঠন নিহত বা উৎখাত হওয়ার সংখ্যা ১-১.৫ মিলিয়ন দাবি করে। বেলগ্রেড, আনুমানিক ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ। ১৮৬৭ সালে উসমানীয় সরকার ব্রিটেন ও ফ্রান্সের চাপের মুখে উত্তর উত্তর সার্বিয়া থেকে সামরিক বাহিনী পিছু হটায়।70

উসমানীয় অনিয়মিত বাহিনী বাশিবাজাউক ১৮৭৬ সালে বুলগেরিয়ানদের একটি উত্থানকে কঠোরভাবে দমন করে এবং এতে প্রায় ১, ০০, ০০০ জন নিহত হয়। রুশ-তুর্কি যুদ্ধে রুশরা জয়ী হয়েছিল। ফলে উসমানীয়দের হাতে থাকা ইউরোপীয় এলাকাগুলোর দ্রুত অবনতি হতে থাকে। বুলগেরিয়া রাজ্য উসমানীয় সাম্রাজ্যের ভেতরেই একটি স্বাধীন রাজতন্ত্র গঠন করে। রোমানিয়া স্বাধীন হয়ে যায়। সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো অল্প এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮৭৮ সালে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি উসমানীয় প্রদেশ বসনিয়া ভিলায়েত ও নোভি সানজাক দখল করে নেয়। উসমানীয় সরকার এসকল দখল প্রচেষ্টার বিপক্ষে অগ্রসর হলেও শেষপর্যন্ত পরাজিত হয়।

১৮৭৮ সালে বার্লিন কংগ্রেসের সময় বলকান উপদ্বীপের উসমানীয় অঞ্চলগুলো ফিরিয়ে দেয়ার বিনিময়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিসরায়েল সাইপ্রাসে ব্রিটেনের প্রশাসন লাভ করেন এবং ১৮৮২ সালে মিশরে সেনা প্রেরণ করে উরাবি বিদ্রোহ দমনের জন্য উসমানীয়দের সহায়তা করা হয়।71

১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত সাম্রাজ্যজুড়ে বসবাসরত ১, ০০, ০০০ থেকে ৩, ০০, ০০০ আর্মেনীয় হামিদলান গণহত্যা নামক হত্যাকান্ডে নিহত হয়

উসমানীয় সাম্রাজ্য আয়তনের ছোট হতে থাকলে বলকান মুসলিমরা বলকানে অবশিষ্ট ভূখন্ড বা আনাতোলিয়ার মূল ভূখন্ডে আসা শুরু করে। ১৯২৩ সাল নাগাদ শুধু আনাতোলিয়া ও পূর্ব থ্রেস মুসলিম ভূখন্ড হিসেবে টিকে ছিল।72

পরাজয় ও বিলুপ্তি (১৯০৮-১৯২২)

১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে উসমানীয় মিল্লাত নেতৃবৃন্দ কর্তৃক তরুণ তুর্কি বিপ্লব ঘোষণা। এর পথ ধরে পরবর্তীতে বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং বসনিয়ান সংকট শুরু হয়।

১৯০৮ সালে তরুণ তুর্কি বিপ্লবের পর দ্বিতীয় সাংবিধানিক যুগ শুরু হয়। বিপ্লবের পর ১৮৭৬ সালের সংবিধান এবং উসমানীয় সংসদ পুনরায় চালু করা হয়। বিপ্লব পরবর্তী ছয় বছর ব্যাপক আকারে রাজনৈতিক ও সামরিক সংস্কার শুরু হলেও এই সময়কে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির সূচনা হিসেবে ধরা হয়। এই সময়টি কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেসের আধিপত্যকাল ছিল।

গৃহবিবাদের সুবিধা নিয়ে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ১৯০৮ সালে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করে নেয় তবে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য উসমানীয় ও অস্ট্রিয়ানদের মধ্যকার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অঞ্চল নোভি পাজার সানজাক থেকে

70"145th Anniversary of the Circassian Genocide and the Sochi Olympics Issue", Reuters, 22 May 2009, https://www.reuters.com.

71 A.J.P Taylor, The Struggle for Mastery in Europe, 1848–1918, Oxford: Oxford University Press, p. 228–54.

72 Matthew J. Gibney; Randall A. Hansen, Immigration and Asylum: From 1900 to the Present, p. 437.

সেনা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিল। ইতালীয়-তুর্কি যুদ্ধের সময় উসমানীয়দের বিরুদ্ধে বলকান লীগ যুদ্ধ ঘোষণা করে। উসমানীয়রা বলকান যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। পূর্ব থ্রেস ও ঐতিহাসিক উসমানীয় রাজধানী এডির্ন ছাড়া বাকি অঞ্চলগুলো যুদ্ধের সময় হারাতে হয়। ধর্মীয় কারণে নির্যাতনের আশঙ্কায় প্রায় ৪, ০০, ০০০ মুসলিম বর্তমান তুরস্কে পালিয়ে আসে। একটি কলেরা মহামারীতে অনেকে যাত্রার সময় মারা যায়। জাস্টিন ম্যাককার্থির হিসাব অনুযায়ী ১৮২১ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত বলকানে উসমানীয় মুসলিমদের উপর জাতিগত নিধনযজ্ঞের ফলে কয়েক মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং প্রায় সমসংখ্যক পালিয়ে যায়।[73] ১৯১৪ সাল নাগাদ উসমানীয় সাম্রাজ্য ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় তার অধিকাংশ অঞ্চল হারিয়ে ফেলে। এসময় সাম্রাজ্যের অধীনে ২৮ মিলিয়ন জনসংখ্যা ছিল যার ১৫.৫ মিলিয়ন বর্তমান তুরস্কে, ৪.৫ মিলিয়ন সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও জর্ডানে এবং ২.৫ মিলিয়ন ইরাকের অধিবাসী ছিল। বাকি ৫.৫ মিলিয়ন বাসিন্দা ছিল উসমানীয়দের অনুগত আরব উপদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত।

১৯১৪ সালের নভেম্বরে উসমানীয় সাম্রাজ্য কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়। উসমানীয়রা মধ্যপ্রাচ্য রণাঙ্গনে অংশ নিয়েছিল। যুদ্ধের প্রথমদিকে উসমানীয়রা বেশ কিছু বিজয় অর্জন করেছিল। এর মধ্যে গ্যালিপলির যুদ্ধ ও কুত অবরোধ অন্তর্গত। তবে রুশদের বিরুদ্ধে ককেসাস অভিযানে ব্যর্থতার মত উদাহরণও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কখনো উসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি।

১৯১৫ সালে রুশ ককেসাস সেনাবাহিনী পূর্ব আনাতোলিয়ায় অগ্রসর অব্যাহত রাখে।[74] উসমানীয় সরকার স্থানীয় জাতিগত আর্মেনীয়দের স্থানান্তর শুরু করে। ফলশ্রুতিতে প্রায় ১.৫ মিলিয়নের মত আর্মেনীয় মৃত্যুবরণ করেছিল যা আর্মেনীয় গণহত্যা বলে পরিচিত। এছাড়াও গ্রিক ও এসিরিয়ান সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধেও বড় আকারের হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

১৯১৬ সালে আরব বিদ্রোহ শুরু হলে তা মধ্যপ্রাচ্য রণাঙ্গনে উসমানীয়দের স্রোতকে উল্টে দেয়। ১৯১৮ সালের ৩০ অক্টোবর মুড্রোসের যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষর হলে তা মধ্যপ্রাচ্যের লড়াইয়ের অবসান ঘটায় এবং এরপর কনস্টান্টিনোপল দখল ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভাজনের ঘটনা ঘটে। ১৯ শতকের শেষ চতুর্থাংশ ও ২০ শতকের প্রথম অংশে প্রায় ৭-৯ মিলিয়ন তুর্কি মুসলিম উদ্বাস্তু হাতছাড়া হওয়া ককেসাস, ক্রিমিয়া, বলকান ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলো থেকে আনাতোলিয়া ও পূর্ব থ্রেসে চলে আসে।

কনস্টান্টিনোপল ও ইজমির দখলের ঘটনার কারণে তুর্কি জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের অধীনে তুর্কিরা স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী হয়। ১৯২২ সালের ১ নভেম্বর সালতানাত বিলুপ্ত করা হয় এবং শেষ সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ ১৭ নভেম্বর দেশ ছেড়ে চলে যান। সালতানাত বিলুপ্ত হলেও এসময় খিলাফত বিলুপ্ত করা হয়নি। ষষ্ঠ মুহাম্মদের স্থলে দ্বিতীয় আবদুল মজিদ খলিফার পদে বসেন। ১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর গ্র্যান্ড

73 Broadberry/Harrison, The Economics of World War, Cambridge University Press, p. 112.
74 Encyclopædia Britannica, "Armenian massacres (Turkish-Armenian history)", Britannica Online Encyclopedia, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/35323/Armenian-massacres.

ন্যাশনাল এসেম্বলি তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ খিলাফত বিলুপ্ত করা হলে[৯২] অতঃপর সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় আবদুল মজিদ দেশত্যাগ করেন।[75]

প্রথম সেলিম – ১৫১৭-১৫২০খ্রি. (মামলুক সালতানাতের পরাজয়ের পর ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় আল মুতাওয়াক্কিলের কাছ থেকে সেলিমের কাছে উপাধি হস্তান্তরিত হয়)

প্রথম সুলাইমান – ১৫২০-১৫৬৬

দ্বিতীয় সেলিম – ১৫৬৬-১৫৭৪

তৃতীয় মুরাদ – ১৫৭৪-১৫৯৫

তৃতীয় মুহাম্মদ – ১৫৯৫-১৬০৩

প্রথম আহমেদ – ১৬০৩-১৬১৭

প্রথম মোস্তফা – ১৬১৭-১৬১৮

দ্বিতীয় উসমান – ১৬১৮-১৬২২

প্রথম মোস্তফা,   পুনরায় ক্ষমতালাভ – ১৬২২-১৬২৩

চতুর্থ মুরাদ – ১৬২৩-১৬৪০

প্রথম ইবরাহিম – ১৬৪০-১৬৪৮

চতুর্থ মুহাম্মদ – ১৬৪৮-১৬৮৭

দ্বিতীয় সুলাইমান – ১৬৮৭-১৬৯১

দ্বিতীয় আহমেদ – ১৬৯১-১৬৯৫

দ্বিতীয় মোস্তফা – ১৬৯৫-১৭০৩

তৃতীয় আহমেদ – ১৭০৩-১৭৩০

[75] Hakan Ozoglu, From Caliphate to Secular State: Power Struggle in the Early Turkish Republic, p. 8, https://books.google.com.bd/books?id=Cw5V1c1ej_cC&pg=PA8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

প্রথম মাহমুদ – ১৭৩০-১৭৫৪

তৃতীয় উসমান – ১৭৫৪-১৭৫৭

তৃতীয় মোস্তফা – ১৭৫৭-১৭৭৪

প্রথম আবদুল হামিদ – ১৭৭৪-১৭৮৯

তৃতীয় সেলিম – ১৭৮৯-১৮০৭

চতুর্থ মোস্তফা – ১৮০৭-১৮০৮

দ্বিতীয় মাহমুদ – ১৮০৮-১৮৩৯

প্রথম আবদুল মজিদ – ১৮৩৯-১৮৬১

আবদুল আজিজ – ১৮৬১-১৮৭৬

পঞ্চম মুরাদ – ১৮৭৬

দ্বিতীয় আবদুল হামিদ – ১৮৭৬-১৯০৯ (কার্যকরভাবে খলিফা উপাধি ব্যবহার করেন)

১৯০৮ থেকে শুরু করে পরবর্তী সময় উসমানীয় সুলতানরা নির্বাহী ক্ষমতাবিহীন সাংবিধানিক সম্রাট হিসেবে বিবেচিত হতেন। এসময় ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পার্লামেন্ট ক্ষমতা ভোগ করত।

পঞ্চম মুহাম্মদ – ১৯০৯-১৯১৮

ষষ্ঠ মুহাম্মদ – ১৯১৮-১৯২২

দ্বিতীয় আবদুল মজিদ – ১৯২২-১৯২৪

৪. আরবী সাহিত্য

৪.১. আরবী সাহিত্যের যুগবিভাগ

আরবী সাহিত্যের ইতিহাসকে সাধারণত পাঁচভাগে ভাগ করা হয়। যেমন: এক. জাহেলী যুগ। দুই. ইসলামী ও ওমাইয়া যুগ। তিন. আব্বাসী যুগ। চার. তুর্কি বা পতন যুগ। পাঁচ. আধুনিক যুগ।

জাহেলী যুগ (৪৫০খ্রি. ৬২২খ্রি.)

আরবী সাহিত্যের জাহেলী যুগের ঠিক শুরুটা কখন এই ব্যাপারে বিশ্লেষকদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। যেহেতু মূল আলোচনা সাহিত্যের বৈশিষ্ট,প্রকৃতি, উপাদান ইত্যাদি তাই এ ব্যাপারে বিতর্কে না জড়িয়ে অগ্রগন্য একটা মতকে উল্লেখ করে সামনে আগানো শ্রেয়। প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক জাহিয, মোস্তফা সাদিক রাফি৺ঈ, আহমদ হাসান যায়্যাত, প্রাচ্যবিদ নিকলস তাদের মতে জাহেলি যুগের সময়সীমা শুরু হয়েছে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে।[76] আর ৬২২খৃষ্টাব্দে রাসূল (সা) কর্তৃক মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাহেলি যুগের সমাপ্তি ঘটে।

সকল সাহিত্যের শুরুটা হয় কবিতার মাধ্যমে। আরবী সাহিত্যের জাহেলী যুগেও একই দৃশ্য দেখা যায়। বক্তৃতা, প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি সবকিছু সাহিত্যের উপাদান হিসাবে থাকলেও কবিতার চর্চাই মূলত জাহেলী সাহিত্যের মূল উপাদান ছিল।

জাহেলী সাহিত্যের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট হল দীর্ঘসূত্রিতা পরিত্যাগ করে সংক্ষিপ্ত ব্যাপকঅর্থবোধন শব্দ ব্যাবহার করা। বিশেষ করে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী শব্দ ব্যবহার জাহেলি সাহিত্যকে অন্যান্য সাহিত্য থেকে বৈশিষ্টমণ্ডিত করেছে। যেমন, সাহিত্যকর্মটি যদি কোন যুদ্ধ বিষয়ক হয় তখন তেজস্বী শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আবার অপরিচিত কোন পথঘাট, মরুভূমির বর্ণনা দিতে জাহেলি সাহিত্যিকগণ অনেক জটিল, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করতেন। একইভাবে প্রেম-ভালবাসা, মমত, শোক ইত্যাদি বিষয়বস্তুতে অনেক সহজ সরল সুমিষ্ট সাবলিল বর্ণনা ও শব্দ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। [77] জাহেলি সাহিত্য যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মরুচারী বেদুঈনদের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে তাই তাদের সাহিত্যের মধ্যেও রয়েছে তাদের জীবনাচরণের মত আবেগ, উদ্দীপনা, খোলা প্রকৃতির প্রতি অনুভূতির গভীর ছাপ। বেদুঈনরা যেমন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করতনা তাই চলাচলের বিভিন্ন দৃশ্য তাদের ভাবনাগুলোর মধ্যে ভিন্নতা তৈরি করত। তারই ফলশ্রুতিতে তাদের কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যেও বিক্ষিপ্তভাব প্রকাশ পেত। নানান বিষয়বস্তু দিয়ে একটি কবিতা সম্পন্ন হত।

জাহেলী কবিতার নির্দিষ্ট একটি কাঠামো আছে। কবিতার বিষয়বস্তু যাইহোক কবিরা নির্দিষ্ট গঠনশৈলীর ভিত্তিতেই কবিতা লিখত। যেমন: প্রথমে প্রেমিকার গুণাগুন বর্ণনা, তারপর প্রেমিকা যে উটে চড়ে সে উটের বর্ণনা তারপর মূল বিষয়বস্তু বর্ণনা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কা৺ব বিন যহায়র রাসূলের নামে কুৎসা রটনা করে কবিতা লিখে।

[76] আল-জাহিয, কিতাবুল হায়াওয়ান, আব্দুস সালাম হারুন সম্পাদিত, তৃতীয় সং, বৈরুত, পৃ. ৭৪।
[77] ড. ইয়াহইয়া আল জাব্বুরি, আশ শি'রুল জাহেলি, নবম সং, বৈরুত: মু'আসসাতু আর রিসালাহ, পৃ. ২৭৫।

অতঃপর তার বিরুদ্ধে রাসূল(সা) হত্যার আদেশ দেন। পরবর্তীতে কা'ব বিন যুহায়র রাসূলের দরবারে গোপনে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলকে লক্ষ্য করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। রাসূল(সা) খুশি নিজের গায়ের চাদর কা'বকে উপহার দেন ; যেটা ইতিহাসে কাসিদাতুল বুরদাহ নামে পরিচিত। উক্ত কাসিদাতুল বুরদাও জাহেলী সাহিত্যের নির্দিষ্ট কাঠামোর উপর রচিত হয়েছে। যেমন:

জাহেলী সাহিত্যের বিষয়স্তুসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল মরুভূমি, পশু-পাখি, চারণভূমি, বংশ গৌরব, আতিথেয়তা, শৌর্য-বীর্য, শক্তিশালী ঘোড়া, যুদ্ধ বিগ্রহ , মদ, নারী, জুয়াখেলা ইত্যাদি যেগুলো তৎকালীন জাহেলি সমাজকে বৈশিষ্টমণ্ডিত করেছিল।

কেউ কেউ জাহেলী যুগকে দুইটি পর্বে বিভিক্ত করেছেন। একটি হল প্রস্তুতি পর্ব অন্যটি হল বিকাশ পর্ব। প্রস্তুতি পর্বে সাধারণত খণ্ড কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় আর বিকাশপর্বে কাসিদা তথা দীর্ঘ কবিতার রূপ পাওয়া যায়। বিকাশপর্বের উজ্জ্বলতম উদাহরণ হল সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা। খণ্ড কবিতা থেকে পরিপূর্ণ কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে ইমরাউল কায়েস এবং মুহালহিলের নাম সবার আগে আসে। তবে জাহিজের মতে, যদিও ইমরাউল কায়েস ও মুহালহিল পরিশিলিত ও শৃংখলিত কাব্যসড়কের প্রথম পদাচারণাকারী হিসাবে ধরা হয় কিন্তু তারা মোটেও প্রথম নয় বরং তারা হলেন অনুজ ও উত্তর প্রজন্মের কবি। কেননা তাদের কাব্যচর্চার পূর্বেই জাহেলী কবিতার মধ্যে যথেষ্ট নিয়ম-রীতি চালু ছিল; যেগুলোর উপর ভিত্তি করে তারা কবিতা চর্চার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। কবিতার বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করলেও একই দৃশ্য দেখা যাবে। তথা জাহেলী যুগের শেষ সময়ে এসে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তারা কবিতার বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব আনেননি বরং পূর্বের দেখানো বিষয়বস্তুর উপরই লেখা হয়েছিল। এ ব্যাপারে স্বয়ং জাহেলি কবি যহায়ন ইবনে আবি সুলমা এবং আনতারা ইবনে শাদ্দাদের পরিচিত দুইটি কবিতার পঙতি উল্লেখযোগ্য-

ما أرنا نقول ألا معارا + أو معادا من قولنا مكرورا তথা আমরা যা বলছি তা হয়তো অন্যের ধারকৃত কিংবা পুনরাবৃত্তি; নতুবা পুনরালোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়- যুহায়র ইবনে আবি সুলমা।[78]

هل غادر الشعراء من متردم + أم هل عرفت الدار بعد توهم তথা পূর্ববর্তী কবিগণ জোড়াতালি দেয়ার মত কোন অবকাশ রেখে গেছেন কি? নাকি তুমি ভেবে চিন্তে প্রিয়ার গৃহ চিহ্নিত করতে পেরেছ?- আনতারা ইবনে শাদ্দাদ।[79]

ইসলামী ও উমাইয়া যুগ (৬২২খ্রি.- ৭৫০খ্রি.)

মহানবী মুহাম্মদ(সা) এর মদীনায় গমন এবং সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একদিকে আরবী সাহিত্যের জাহেলি যুগের সমাপ্তি হয়েছে অন্য দিকে হয়েছে ইসলামী যুগের সূচনা। অনেক সাহিত্যিক এমন ছিলেন যারা জাহেলি ও ইসলামী উভয়যুগ পেয়েছেন তাদেরকে বলা হয় মুখাদরামুন

78 ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন, প্রথম প্রকাশ, (চট্টগ্রাম: আহমদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৫), পৃ. ৯।
79 আয্ যাওযানি, শরহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'ঈ, মুহাম্মদ ইবরাহিম সালিম সম্পা. (কায়রো: দারুত তালা'ই, ১৯৯৩), পৃ. ১৮১।

www.nagorikpathagar.org

সাহিত্যিক। সাধারণত উমাইয়া যুগকে ইসলামী যুগের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যদিও কেউ কেউ ৬৬১খৃষ্টাব্দ থেকে ৭৫০খৃঃ পর্যন্ত সময়কালকে পৃথকভাবে উমাইয়া যুগ হিসাবে অবহিত করেন। আর আরবী সাহিত্যের উমাইয়া যুগের সমাপ্তিকাল ধরা হয় ৭৫০ সাল তথা উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের সময় পর্যন্ত।

ইসলামী যুগের আরবী সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট হল সাহিত্যে ইসলাম ধর্মের সরাসরি প্রভাব। জাহেলি যুগের যতসব বিষয়বস্তু ছিল যেমন মদ, নারী, বংশগৌরব ইত্যাদি সবকিছু ইসলামী যুগে পবিত্রতা, নৈতিকতা, ভ্রাতৃত্ব, সমতা ইত্যাদি বিষয়বস্তুতে রূপ নেয়। ইসলামী যুগ শুরু হওয়ার পর সামগ্রিক কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনটা ধারা সৃষ্টি হয়। এক. যারা ইসলামের পক্ষে এবং ইসলাম বিরোধীদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে কাব্য চর্চা করেন। তাদের কবিতার মধ্য দিয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে কবি হাসসান বিন সাবিতের নাম অগ্রগন্য। দুই. যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা-অপবাদ রটনা করে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। কা' ব বিন যুহায়র এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তবে কিছুদিন পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিন. অন্য আরেকটি দল যারা কুর' আনের অলৌকিক ভাষাশৈলীতে বিমোহিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সাহিত্য চর্চা ছেড়ে দেন। নিজে সাহিত্য রচনা পরিত্যাগ করে কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান ও মর্মোপলব্ধি করে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। এজন্য জাহেলী যুগ থেকে ইসলামী যুগের সাহিত্য চর্চা কিছুটা হলেও হ্রাস পায়।

আরবী সাহিত্যে ইসলামী যুগের সুন্দর বৈশিষ্টসমূহ টিকে ছিল ততদিন যতদিন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামী পদ্ধতি টিকে ছিল। খেলাফতে রাশেদা শেষ হওয়ার পর শুরু হয় উমাইয়া খেলাফত। ইতিপূর্বে শাসনকর্তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিলনা যে দ্বন্দ্ব উমাইয়া শাসনের সূচনার মাধ্যমে শুরু হয়। গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়, একভাগ হল মদীনাপন্থী অন্যভাগ সিরিয়া তথা দামেস্ক পন্থী। তখন মুসলিম সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্র দামেস্ক ছিল তারপরেও মদীনার লোকজন তাদেরকে মেনে নিতে পারেনি আলী(রা) এর সময়কাল থেকে শুরু হওয়া পূর্ব সংঘাতের কারণে। এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে। তারাও শাসনকর্তাদের সমর্থনে প্রত্যেকের সুবিধামত সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। যেমন, সিরিয়া অবস্থানকারী কবিরা সিরিয়ার শাসকদের প্রশংসায় কবিতা লিখেন এবং মদীনার বিদ্রুপ করেন। অপরদিকে মদীনায় অবস্থানকারী সাহিত্যক সিরিয়ার শাসকদের বিরুদ্ধে কবিতা লেখেন। এবং কবিরা নিজেরাও একে অপরের বিরোধীতা করেন, যেমনিভাবে জাহেলি যুগে এক গোত্র অপর গোত্রকে বিদ্রুপ করে কবিতা লিখত। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এই বাদ প্রতিবাদ সহিত্যচর্চাকে " নাকায়িদ" হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। নাকায়িদ আরবী সাহিত্যের বিশাল অংশজুড়ে প্রভাববিস্তার করে আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকরা হলেন- জারির, ফারাজদাক, আখতাল।

উমাইয়া শাসনকালের প্রথম পর্যায়ে শাসকরা সাম্রাজ্য বিস্তার যুদ্ধ বিগ্রহ সহ উন্নয়নের নানা প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। ৬৬১ থেকে মূলত সাহিত্যের উমাইয়া যুগ ধরা হয়। আর তখন থেকেই মূলত মুসলমানদের মধ্যে ভোগ বিলাসিতা অতিমাত্রায় চিত্তবিনোদন শুরু হয়, যা কিছুক্ষেত্রে জাহেলি অনেক বৈশিষ্টের অনুরূপ ছিল। একে অপরের দোষারোপ করে কবিতা চর্চা শুধু রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যই না বরং নিছক সময় কাটানো, বিনোদন করার জন্যও এসব কবিতার আসব জমানো হত। শাসক ও কবি উভয়ই মাতাল হয়ে কবিতা, নাচ গানের আসর জমাত। অশ্লীল প্রেমকাব্যের চর্চাও ব্যাপক পরিমাণে হয়েছিল তৎকালীন

অলসমস্তিষ্ক লোকদের মাঝে। এক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠিরও কৌশলগত অবস্থান ছিল। তারা পরিকল্পিতভাকেই লোকদেরকে আনন্দ বিনোদনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করত, যেন কোন ধরণের বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে না উঠে।[80]

আব্বাসী যুগ (৭৫০খ্রি.- ১২৫৮খ্রি.)

আব্বাসী যুগ মুসলিম বিশ্ব কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা সর্বদিক থেকে উন্নয়নের চরম শিখরে আরোহণ করে। ৭৫০ সাল থেকে উমাইয়া যুগের সমাপ্তির সাথে আব্বাসী যুগের সূচনা হয়। আর শেষ হয় ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ নগরী ধ্বংস করা পর্যন্ত। আব্বাসী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনের পুনরুদ্ধার, নবসংস্করণ, ও সম্প্রসারণ হয়।[81] খলিফা আল মামুনের (৮১৩খ্রি.-৮৩৩খ্রি.) সময়কালে বাইতুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণে ভিন্নভাষার সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আরবীতে স্থানান্তর করা হয়। ধর্মীয় বিষয়গুলোও আলেমগণ তর্কশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। গ্রীক ও ভারতীয় সকল জ্ঞান বিজ্ঞান সহজ সরল আরবী ভাষায় অনূদিত হয়।[82]

সামগ্রিকভাবে আব্বাসী যুগের সাহিত্যকে রাজনৈতিক প্রভাবের দিক থেকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: আব্বাসী যুগের প্রথম দিকে শাসকদের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল পারসিকদের(সময়কাল ৭৫০খ্রি.-৮৪৬খ্রি.)। পারসিক নওমুসলিম তথা মাওয়ালিদের পুঞ্জিবিত ক্ষোভই মূলত আব্বাসী বিপ্লবকে সফল করে। কারণ, উমাইয়া আমলে মাওয়ালিদেরকে ভিন্ন চোখে দেখা হত এবং খাঁটি আরবরাই সমাজের সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেত। পারসিকদের মধ্যে একদল ছিল যারা পারসিক সংস্কৃতি তথা অগ্নীপূজা সহ অন্যান্য ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতির সাথে মিলিয়ে একধরণের সংশয়বাদ প্রকারান্তরে ধর্মহীনতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ধর্মহীনতার প্রভাব মারাত্মকভাবে তৎকীলন সাহিত্যের উপর বিস্তার করে সাহিত্য অঙ্গনে নোঙরামি বেহায়াপনা আর বেলেল্লাপনার রঙ্গে রঞ্জিত করে। এ প্রসঙ্গে ড. ত্বহা হোসাইন বলেন, তাদের বেহায়াপনা এত বেশি সীমালঙ্গন করেছে যে, সে যুগের এমন বহু কাব্যগ্রন্থ আছে যেগুলো পড়া যাবে কিন্তু শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করা যাবেনা। [83]

এ সময় গদ্য সাহিত্যেরও ব্যাপক উন্নয়ন হয়; যা ইতিপূর্বে উমাইয়া যুগে অনেক সীমিত পর্যায়ে ছিল। উমাইয়া যুগে কেবল খাঁটি আরবদের মাধ্যমে সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চা হওয়ায় ভিন্ন সংস্কৃতি-সভ্যতার জ্ঞান চর্চা হয়নি, কিন্তু আব্বাসী যুগে তার বিপরিত দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ, তখন শুধু আরবদের হাতেই জ্ঞান বিজ্ঞানের চাবি কাঠি সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং নতুন মুসলিম যারা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠি থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে এসেছিলেন তারাই সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে ছিল। এক্ষেত্রে ইবনে মুকাফফার নাম অগ্রগন্য। তিনি পারস্য বংশোদ্ভূত ছিলেন। ফারসি ভাষার পাশাপাশি গ্রীক সংস্কৃতিকে ধারণ করে আরবী ভাষায় অনেককিছু আমাদানী করেন। তার

[80] ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগোক্ত, পৃ. ২৬-৩৮।
[81] P.k. hitti,op.cit, p.557.
[82] ড. আহমদ আমিন, দুহাল ইসলাম, মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ অনূদিত, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০২), খ. ২, পৃ. ১৪-১৫।
[83] ত্বহা হোসাইন, হাদিসুল আরবি'আ, ১১শ সং, (মিশর: দারুল মা'আরিফ), খ. ২, পৃ. ২৪।

ফারসী থেকে আরবীতে অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে কালিলা ওয়া দিমনাহ অনেক প্রসিদ্ধ। তিনি অনুবাদের পাশাপাশি নিজস্ব চিন্তা ধারার আলোকে আরবী গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বিস্তারে অবদান রাখেন। [84]

আব্বাসী সাহিত্যের আরেকটি ভাগে তুর্কিরা প্রভাব বিস্তার করেছে (সময়কাল ৮৪৬খ্রি.- ৯৪৬খ্রি.)। এসময় শাসকরা তুর্কি সেনা প্রভাবিত ছিল। তুর্কিরা প্রথমদিকে দাস হিসাবে রাজ্যের কাজে অংশ নিয়ে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসন হাতে নিতে সক্ষম হয়। তুর্কিরা জ্ঞান বিজ্ঞানে ছিল শূন্যের কোঠায়। তাই তাদের সময়ে কেবল শাসকদের পালাবদল হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি বরং পূর্ববর্তী ধারায় যা চর্চা হওয়ার হয়েছে; কোন নতুনত্ব আসেনি।

তৃতীয় পর্বটি ছিল বুয়াইহি যুগ (সময়কাল- ৯৪৬খ্রি. – ১০৫৫খ্রি.)। বুয়াইহিরা ছিল শিয়া মতালম্বী। তাদের সময়ে সাহিত্য প্রকৃতি, উৎসব, উদযাপন ইত্যাদি বিষয়বস্তু দিয়ে রচিত হয়েছিল। পাশাপাশি পারসিক জাতির অতীত ঐতিহ্য, সমৃদ্ধি ও তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির বিস্তৃত বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে। এসময়কার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী যিনি কিতাবুল আগানী গ্রন্থ্ রচনা করে আরবী সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।[85]

আব্বাসীদের শেষ সময়ে যে পর্বটি ছিল সেটি সেলজুকি পর্ব (সময়কাল- ১০৫৫খ্রি.- ১২৫৮খ্রি.)। সেলজুকরা ছিল বেদুঈন তুর্কি এবং সুন্নি মুসলিম। তারা শিয়াপন্থী বুয়াইহিদের হটিয়ে আব্বাসী শাসকদের ভারমুক্ত করেন। সেলজুকরা প্রথমদিকে জ্ঞান বিজ্ঞানে পশ্চাদপদ থাকলেও সাহিত্যকদের পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষেত্রে মোটেও কার্পণ্য করেন নি। বিশেষ করে তাদের পারস্য উজির নিজামুল মুলক কর্তৃক ”নিজামিয়া শিক্ষালয়টি ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। তবে সেলজুকদের আগ্রহ বেশিদূর টিকে থাকেনি বরং আব্বাসী আমলের শেষ দিকে এসে সাহিত্য চর্চা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হতে থাকে। কেবল রাজা বাদশাহদের চাটুকারিতায় দুচারটি কবিতা রচিত হয়েছে তখন। কবিদের কবিতা মিথ্যার বেসাতি আর ভিক্ষার ঝুলিতে পরিণত হয়।[86]

আব্বাসী যুগে সাহিত্যের ভিন্ন একটি ধারা ছিল স্পেনীয় সাহিত্য পর্ব। এই সাহিত্য গড়ে উঠে আব্বাসীদের সময়ে স্পেনে অবস্থানরত উমাইয়া আরবদের মাধ্যমে। একই সময় হলেও স্থানের ভিন্নতার দরুন আব্বাসী সাহিত্য থেকে স্পেনীয় সাহিত্য অনেক তফাৎ ছিল। স্পেনীয় সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো প্রেমমূলম সংগীতে কোমল বীররাসত্মক অনুভূতির আতিশয্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় সংবেদনবোধ। বিশেষ করে ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি ঘটেছে তাদের সাহিত্যে। স্পেনীয় সাহিত্যে কর্মের মধ্যে মুয়াশশাহাত আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।[87]

পতন যুগ বা তুর্কি যুগ (১২৫৮খ্রি.- ১৭৯৮খ্রি.)

১২৫৮ খ্রি. থেকে এই যুগের শুরু আর শেষ হয়েছে ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণের মধ্য দিয়ে। এই যুগের সাধারণত দুটি অংশ। এক. মামলুকি যুগ (১২৫৮- ১৫১৭ খ্রি.)। দুই. উসমানী

84 প্রাগোক্ত, পৃ. ৩০- ৩১।
85 ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা মণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢোকা: ই. ফা. বা., ১৯৯৫), খ.১৬, পৃ.৩৬৩।
86 আহমদ হাসান যাইয়াত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩।
87 P.k. hitti, op.cit, p. 560.

যুগ (১৫১৭-১৭৯৮খ্রি.)। তুর্কি যুগকে পতন যুগ হিসাবে দোষারোপ করলেও জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন অংশেই এই যুগ পূর্বের যুগ থেকে পিছিয়ে ছিলনা। ইবনে কাইয়্যিম, ইবনে জাওযী, ইবনে ফারিয, ইবনে আরাবী, ইবনে খালদুন, কালকাশিন্দী, আল উমারী, ইবনে মানযুর এর মত জ্ঞানীরা তথাকথিত পতন যুগেই বেড়ে উঠেছিল। তারপরেও ঐতিহাসিকগণের যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু ১২৫৮খ্রি. হালাকু খান কর্তৃক মুসলিমদের জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র বাগদাদ নগরীকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং লক্ষ লক্ষ বই পুস্তক পুড়িয়ে টাইগ্রিস নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয় তাই তৎপরবর্তী যুগে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় সংকট তৈরি হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাগদাদ নগরীকে চেঙ্গিস খানের বংশধরেরা জ্বালিয়ে দিলেও মামলুক তুর্কিরা জ্ঞান বিজ্ঞানের আরেক শহর মিশরকে সুরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাগদাদ নগরী ধ্বংস ও চারদিকে মুসলিমদের পতনের ভয়াবহতা মামলুকদেরকে শংকিত করে তুলে। তাই তারা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে ভালভাবে সংরক্ষণ করার জন্য কোষজাতীয় গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। আন নুয়ারী, আস সাফাদি, ইবনে মানযুর প্রমুখ কোষপ্রণেতা ও অভিধানপ্রণেতা এই যুগেরই সৃষ্টি।[88] কিন্তু শাসকগোষ্ঠি মামলুকদের আরবী ভাষা সাহিত্যে পূর্ব যুগের শাসকদের মত দক্ষ ও সচেতন না হওয়ায় আরবী সাহিত্যের ক্রমই অবনতি হয়েছে। মামলুকদের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট ছিল- তারা স্থাপত্য শিল্পে অনেক উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল। পি. কে হিট্টি বলেন, মিশরের ইতিহাসে টলেমীয় ও ফেরাউনি যুগের পর মামলুকিদের চেয়ে উচু দরের শিল্প-স্থাপত্ব অন্য কোন শাসক সৃষ্টি করতে পারেনি।[89]

অপরদিকে ১৫১৭খ্রি. থেকে মুসলিম সাম্রাজ্য মিশর থেকে তুরস্কে স্থানান্তরিত হয়ে উসমানী সালতানাত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উসমানীরা আরবীর পরিবর্তে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দেয়। বিশেষ করে মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র আরব থেকে এই প্রথম সরাসরি অনারব এক দেশে স্থানান্তরিত হয়। তাই সবকিছুর যাত্রা আরব অভিমুখ থেকে তুরস্ক অভিমুখে শুরু হয়। মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্যের সকল উপাদান তুরস্কে নিয়ে এসে উক্ত স্থানকে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা করে তুর্কি শাসকরা। এসকল দিক বিবেচন করলে খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়, তৎকালীন সময়ে আরব কবি সাহিত্যিকরা নতুন করে আরবী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করার মানসিকতা, উৎসাহ, উদ্দিপনা হারিয়ে ফেলে। বরং ইতিপূর্বে যেগুলো রচিত হয়েছিল সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ভাষান্তর ইত্যাদি কার্যক্রম চালু ছিল।

এই যুগের সাহিত্যের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়। যেমন একদল সাহিত্যিক ছিলেন তারা রাজনীতি, দলাদলি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি নানা কারণে দুনিয়ার প্রতি হতাশ হয়ে সুফিবাদ ও বৈরাগ্যবাদের দিকে ঝুঁকে। উক্ত চিন্তাধারার আলোকে অনেক গল্প কবিতা ও সাহিত্যের অন্যান্য উপাদান রচিত হয়। অপরদিকে বিপরিত চিত্রও দেখা যায়। কেউ কেউ এমন হতাশা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা আর অশ্লীলতায় নিজেদেরকে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন এবং এসব চিন্তার আলোকেও অনেক কবিতা, গল্প সহ সাহিত্যের অনেক উপাদান রচিত হয়েছে।[90] সামগ্রিক আলোচনার পর

[88] জুরজি যায়দান, তারিখুল আদাবিল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ, (মিশর: দারুল হিলাল), খ. ৩,পৃ. ২৯০।
[89] P.k. hitti, op.cit, p. 571.
[90] হান্না আল- ফাখূরী, তারিখুল আদাবিল আরবী, (বৈরুত: আল মাতবা'আ আল বুলিসিয়্যাহ), পৃ. ৮৬০।

www.nagorikpathagar.org

সাহিত্যসমালোচকরা মামলুকী যুগকে কোষ ও সংকলনের যুগ হিসেবে নামকরণ করেছেন যুগ আর উসমানী যুগকে নামকরণ করেছেন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের যুগ হিসেবে।[91]

আধুনিক যুগ (১৭৯৮খ্রি.- চলমান)

১৭৯৮খ্রি. সালে নেপোলিয়নের মিশর আক্রমনের মধ্য দিয়ে আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা হয়। আব্বাসী যুগ পর্যন্ত পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল কেন্দ্রবিন্দু যখন আরবদের হাতে ছিল তখন ইউরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে জ্ঞান- বিজ্ঞান, সভ্যতা- সংস্কৃতির নতুন ও পূর্ণাঙ্গ রূপ আত্মস্থ করে। এদিকে উন্নয়নের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করে ধীরে ধীরে অবনতির দিকে নেমে আসে আরবরা অপরদিকে ইউরোপীয়রা ইতিপূর্বের ধার করা জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আরোহণ করতে শুরু করে উন্নয়নের চরম শিখরে। একপর্যায়ে তাদের চোখ পড়ে সেই নিষ্প্রভ জনগোষ্ঠির উপর যারা একসময় গোটা বিশ্বকে আলোকিত করেছিল এবং ইউরোপীয় সন্তান দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করে ঘুমন্ত মুসলিম আরবদের জাগিয়ে দেয়। তখন থেকে আরবী সাহিত্যে ভিন্ন এক ধারা সৃষ্টি হয় সেই ধারাকেই সাহিত্যের আধুনিক যুগ বলা হয়। জ্ঞান- বিজ্ঞান, সাহিত্য- সংস্কৃতির সেই শুরু হওয়ার পিছনে নেপোলিয়নের কিছু পদক্ষেপ মৌলিক প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। যেমন: এক. শিক্ষালয়গুলোকে সংস্কার ও নতুন করে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা। তন্মধ্যে আল- আজহারের পাঠ্যসূচিতে ব্যাপকভাবে সংস্কার করা হয় এবং নতুন করে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, খ্রিষ্টান ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাশাপাশি আল- আজহারের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপে প্রেরণ করা হয়। দুই. মুদ্রণ যন্ত্র। ষোড়শ শতাব্দিতে ইতালিতে সর্বপ্রথম আরবী মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। তবে মিশর ও লেবাননে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করা হয় নেপোলিয়ের হাত ধরেই। এসময় কোষ জাতীয় গ্রন্থসমূহ, আরবী অভিধান, সাহিত্য, প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য ধ্বংসপ্রায় গ্রন্থসমূহ ছাপা হয়। তিন. সংবাদ পত্র। মুদ্রণযন্ত্র বিকাশের ফলে সংবাদপত্রের সূচনা হয়। সংবাদপত্র একটি জাতির অবস্থানগত দূরত্ব কমিয়ে দেয় এবং তাদের মনন ও বিবেককে শাণিত করে।[92] আরবী সংবাদপত্রের সূতিকাগার হচ্ছে মিশর। প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয় ১৮২৮খ্রি. সালে আল ওয়াকা' ই আল- মিসরিয়্যাহ নামে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে আল- মুয়াইয়্যিদ, আল আহরাম, আল- হিলাল, ইত্যাদি অনেক সংবাদপত্রসমূহ পরিচিতি লাভ করে। চার. বিজ্ঞান একাডেমি ও সাহিত্যসংস্থা গঠন। তন্মধ্যে সিরিয়া বিজ্ঞান একাডেমি, প্রাচ্যদেশীয় বিজ্ঞান সংস্থা, আরবীয় বিজ্ঞান সংস্থা অন্যতম। পাঁচ. প্রাচ্যসম্বন্ধীয় গবেষণা। আধুনিক আরবী সাহিত্যে এই বিষয়টি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ইউরোপীয় ভাষা পন্ডিতরা প্রাচ্যবিষয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেন। বিশেষ করে আরবের উপর তাদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পাকাপোক্ত করার জন্য আরবদেরকে ভালকরে জানতে ও বুঝতে তাদের পন্ডিতগণের উক্ত পদক্ষেপ কার্যকরী ভূমিকা পারন করে। এসব ইউরোপীয় পন্ডিতদের প্রাচ্যবীদ (orientalis) বলা হয়। আধুনিক আরবী সাহিত্যে যুগ যুগ ধরে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

91 জুরজি যায়দান, পূর্বোক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯১।
92 আহমদ হাসান যাইয়্যাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫।

আধুনিক আরবী সাহিত্য সাধারণত দুই ধারায় গড়ে উঠেছে। এক. অনুকরণীয় পদ্ধতি। পূর্ববর্তী উৎকৃষ্ট সাহিত্যকে অনুসরণ করে একদল কবি সাহিত্যিক তাদের সাহিত্য রচনা করেন। দুই. সংস্কার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে প্রাশ্চাত্য বিষয়বস্তু, গঠনশৈলীকে আরবী কবি সাহিত্যিকরা নতুন রূপে তাদের নিজেদের পদ্ধতিতে স্থান দেয়। সামগ্রিকভাবে সাহিত্য চর্চায় একধরণের মিশ্র কলাকৌশলের সূচনা হয়।[93]

৪.২. বিভিন্ন যুগের প্রসিদ্ধ কবিগণ

জাহেলি যুগঃ

ইমরু□উল কায়স (সময়কাল- আনু. ৪৯৭ -৫৪৫খ্রি.): সাহিত্য জগতের সিংহ পুরুষ ইমরু□উল কায়স এর বংশ তালিকা হলো ইমরু□ল কায়স ইবনে হুজর ইবনে হারিস ইবনে আমর ইবনে আকিকুল মুরার ইবনে মু□আভিয়া ইবনে ছাওর। হুনদুজ, মুলাইকা ও আদি এই তিনটি ইমরু□উল কায়েসের নাম হিসাবে ইতিহাসে বর্ণনা পাওয়া যায়। তাছাড়া কিছু উপনামও আছে- আবু ওয়াহাব, আবু যায়দ ও আবু হারিছ। ইমরু□উল কায়স, যুলকুরুহ, মালিকুদ্দিল্লীল এগুলো ছিল তার ডাকনাম। তন্মধ্যে ইমরু' উল কায়েস ডাকনামটি প্রসিদ্ধি পেয়েছে। নজদের আসাদ গোত্রের কিন্দা রাজপরিবারে তার জন্ম। কবির পিতামত হারিছ কিন্দা রাজ্যের সর্বশেষ রাজা ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী হীরার তৃতীয় মুনজির হারিসকে পরাজিত ও হত্যা করে। হারিসের মৃত্যুর পর তার ছেলেরা রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ভাগ করে নেয়। তন্মধ্যে কবির পিতা বনি হুজর ইবনে হারিস ছিল আসাদ গোত্রের শাসক। কবির শৈশব ও কৈশোর সেখানে অতিবাহিত হয়। ইমরু' উলের কবিতায় যে পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার বিবরণ পাওয়া যায় সবই আসাদ গোত্রের লোকালয়। তাগলিব গোত্রের সরদার কুলাইব ও প্রসিদ্ধ কবি মুহালহিল এই ভাই কবির আপন মামা। কাব্যচর্চার ব্যাপারে ইমরু' উলের উপর বংশগত প্রভাব ছিল।

ত্বরাফা বিন আবদ আল বাকরি (সময়কাল- আনু. ৫৩৮- ৫৬৪খ্রি.) :

কবি ত্বরাফা বালক বয়সেই নিজের কাব্য প্রতিভাকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবির বংশ তালিকা হলো- ত্বরাফা ইবনে আবদ ইবনে সুফিয়ান ইবনে সা'আদ ইবনে মালিক ইবনে সা'আদ ইবনে দুবায়'আ ইবনে কায়স ইবনে সা'আলাবা। বকর গোত্রের ঐতিত্যবাহি কবি গোত্রে তার জন্ম। চাচা মুরাক্কিশ, মামা মুতালাম্মিস ও বোন খিরনাক ছিলেন তৎকালিন বিখ্যাত কবি। অর্থাৎ বংশীয় প্রভাবেই কবি প্রতিভা অল্প বয়সে প্রতিভাত হয়। শৈশবে বাবাকে হারানোর পর চাচারা বাবার সম্পত্তি দখল করে নেয়। চাচাদের বিরুদ্ধে বালক কবির প্রতিবাদস্বরূপ কবিতার মাধ্যমেই মূলত কবির কাব্য প্রতিভা পরিস্ফুট হয়।

যুহায়র ইবনে আবি সুলমা (সময়কাল- আনু. ৫২০ - ৬১০খ্রি.) :

93 ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬৬।

মানবতাবাদী কবি হিসাবে পরিচিত যুহায়র ছিলেন বনু মুযায়না বংশোদ্ভূত। কিন্তু তাকে লালন করেছে গাতফান গোত্র। তার বোনের নাম সুলমা। এই হিসাবে তার বাবা আবু সুলমা উপনাম ধারণ করেন ও এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কবির পিতার আসল নাম হল রাবিয়া ইবনে রিয়াহ ইবনে কুররাহ ইবনে হারিছ। বাল্যকালে যুহায়র তার পিতাকে হারালে তার লালনপালনের দায়িত্ব নেন তার মামা বাশামা ইবনে গাদির। বাশামা ছিলেন বিচক্ষণ নেতা। গাতফান গোষ্ঠি কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পূর্বে বাশামার নিকট পরামর্শ করতেন।

লাবিদ ইবনে রাবী' আ (সময়কাল- আনু. ৫৪০- ৬৬১খ্রি.) :

লাবিদের পারিবারিক ডাক নাম আবু আকিল। তার বংশ তালিকা হলো- লাবিদ ইবনে রাবী' আ ইবনে মালেক ইবনে জা' ফর ইবনে কিলাব ইবনে রাবী' আ। দীর্ঘ হায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কবি লাবিদ অন্যতম। জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগ পেলেও তিনি জাহেলী যুগের কবি হিসেবেই পরিচিত। কারণ, ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি কোন ধরণের কবিতা লিখেননি বললেই চলে। এবং ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রেও তার কবিতা পাওয়া যায়না, হাসসান বিন সাবিত, কা' ব বিন মালেক, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা প্রমুখ কবিগণ যেমন ছিলেন। দানশীলতার জন্য আমৃত্যু কবি ও তার পরিবার আরবে বেশ সুপরিচিত ছিলেন।

আনতারা ইবনে শাদ্দাদ (সময়কাল- আনু. ৫২৫- ৬১৫খ্রি.) :

আনতারা ইবনে শাদ্দাদ তার পিতার দাসী যাবিবার উদরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই প্রথম দিকে আরবের রীতি অনুসারে তার পিতা ও গোত্র তাকে বংশের অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। এই অবহেলা আনতারার মনে অনেক বড় রেখাপাত সৃষ্টি করে; যা আনতারার বীরত্ব ও কাব্যপ্রতিবাকে উন্মোচন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। নিচের ঠোঁট কাটা ছিল তাই কবিকে আল ফালহা উপাধিতে কেউ কেউ ডাকত। কবির বংশ তালিকা হলো- আনতারা ইবনে ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর ইবনে কুরাদ ইবনে মাখযুম।

আমর ইবনে কুলসুম (সময়কাল- আনু. ৫২৬ - ৫৮৪খ্রি.) :

তাগলিব গোত্রের নেতা আমর ইবনে কুলসুম এর বংশ তালিকা হলো- আমর ইবনে কুলসুম ইবনে আত্তাব ইবনে সা' দ ইবনে যুহায়র ইবনে জুশাম ইবনে বাকর ইবনে হাবিব ইবনে আমর ইবনে গানম ইবনে তাগলিব। তার মা লায়লা ছিলেন কবি মুহালহিলের কন্যা। তার পিতাও ছিলেন তাগলিব গোত্রের নেতা। তাগলিব গোত্র ছিল কঠিন প্রকৃতির। কবির মধ্যেও সেই প্রকৃতি- স্বভাব পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে, ইসলামের আগমন যদি আরো কিছুদিন বিলম্ব হত তাহলে তাগলিব গোত্রের লোকজন মানুষ ভক্ষণ শুরু করত।

হারিস ইবনে হিল্লিযা (মৃত্যু- আনু. - ৫৮০খ্রি.) :

কবি হারিস ইবনে হিল্লিযার উপনাম ছিল আবু যলিম। তার বংশ তালিকা হচ্ছে হারিস ইবনে হিল্লিযা ইবনে মাকরুহ ইবনে য়াযিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক। হারিস ও আমর ইবনে কুলসুম হীরার বাদশাহ আমর ইবনে হিন্দ এর দরবারে কাব্যিক তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন।

সানফারা- কবির মূল নাম সাবেত ইবনে আওস আজদি। তিনি পেশায় ডাকাত ছিলেন। তার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ একটি গল্প আছে। সে বনু সালামান গোত্রের একশত লোক হত্যা করার ব্যাপারে শপথ করেছিল। নিরানব্বইজন হত্যা করার পর সে শত্রুদের হাতে বন্দী ও নিহত হয় কিন্তু শত্রুদলের একজন শানফারার মৃত দেহে পদাঘাত করার পর আহত হয়ে এক পর্যায়ে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে তার একশত হত্যার শপথ পূর্ণ হয়। শানফারা ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে মৃত্যুবরণ করেন।[94]

তাআব্বাতা শাররা- কবির মূল নাম সাবেত ইবনে জাবের আল ফাহমি। তার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মত হলো- তিনি পেশায় চোর অথবা গোপ্তঘাতক ছিলেন। আর নিজের সাথে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে কবিতা আবৃত্তি করতেন। এক সহকর্মী কবির খোঁজে বাড়িতে আসলে কবির মা বলেন, তাআব্বাতা শাররা ওয়া খারাজা অর্থাৎ বগলে মন্দ তথা তরবারি বহন করে বের হয়ে গেছে। এরপর পর থেকে কবি তাআব্বাতা শাররা নামে পরিচিত হোন। কবির মৃত্যু আনু. ৫৩০ খ্রি. সালে।

উরওয়াহ ইবনে ওয়ারদ- কবির মূল নাম ইবনে জায়েদ আমর ইবনে আবস ইবনে বাগিদ। পেশায় ডাকাত ছিলেন। তিনি আনু. ৫৯৬ খ্রি. সালে মৃত্যবরণ করেন।

মুহালহিল- আবু লায়লা আদি ইবনে রবিআ আত-তাগলিবি। তিনি ইমরাউল কায়েসের মামা ছিলেন এবং আমর ইবনে কুলসুমের নানা ছিলেন। তার মৃত্যু আনু. ৫৩১খ্রি.সালে।

হাতেম তাঈ- হাতেম ইবনে আব্দুল্লাহ। তাঈ গোত্রের লোক। দানশীলতার জন্য আজও পৃথিবীব্যাপি বিখ্যাত হয়ে আছেন। মৃত্য সন আনু. ৬০৫খ্রি.।

সালামা ইবনে জানদাল- আবু মালেক সালামা ইবনে জানদাল ইবনে আবদে আমর। হিজাজের কাব তামিমী গোত্রের লোক। মৃত্য বরণ করেছেন ৬০৮খ্রি.সালে।

আফওয়াহ আল আওদি- আবু রাবিআ সুলায়া ইবনে আমর ইবনে আওদ। গোত্রের বিভিন্ন যুদ্ধে সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ করতেন। মৃত্য- ৫৭০ খ্রি. সালে।

দুরাইদ ইবনে সিম্মাহ- উপাধি ছিল আল জুশামি। কবি খানসাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু খানসা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইসলামী যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেননি। বলা হয়ে থাকে তিনি একশরও বেশি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যু- আনু. ৬৩০ খ্রি. সালে।

[94] ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চোধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২, ১৭৪, ২০৩, ২৪০, ২৬৩, ২৯২, ৩১৫ ৩৩৪।

www.nagorikpathagar.org

কায়েস ইবনে খাতিম- আওস গোত্রের নেতা ছিলেন। মৃত্যু- আনু. ৬১২ খ্রি. সালে।

নাবিগা যুবয়ানি- যুবইয়ানি গোত্রের নেতা ছিলেন। জাহেলী সমাজে যুদ্ধবাজ ও রাজনীতিক হিসাবে পরিচিত। মৃত্য বরণ করেছেন ৬০৪ খ্রি.সালে।

আ' শা আল আকবার- ইয়ামামায় ৫৩০খ্রি. সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। জীবিকার জন্য দেশে দেশে ঘুরেছেন। মৃত্যু বরণ করেছেন ৬২৯ খ্রি.সালে।

উবায়েদ ইবনে আবরাস- বনু আসাদ গোত্রের কবি। ৫৫৪খ্রি.সালে মুনজিরের হাতে নিহত হোন।

আবু দোয়াদ আল ইয়াদ- হানজালা ইবনে শারকি। বুরদ ইবনে দা□আমি ইবনে ইয়াদ গোত্রের লোক ছিলেন।

মুরাক্কাশ আল আকবার- আওফ ইবনে সা□দ ইবনে মালেক। জন্মগ্রহণ করেছেন ইয়ামানে আর বড় হয়েছেন ইরাকে। গাসসানি রাজার প্রশংসা করে রাজার কাতিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। মৃত্য- ৫৫০খ্রি. সালে।

আলকামা আল ফাহাল- আলকামা ইবনে আবদাহ। তামিম গোত্রের লোক। মৃত্য- ৬০৩ খ্রি. সালে।

আল মুতালাম্মিস- জারির ইবনে আব্দুল মাসিহ আদদবয়ি। ত্বরাফা ইবনে আবদ তার ভাগ্নে ছিলেন। মৃত্যু- ৫৮০খ্রি. সালে।

লাবিদ ইবনে রাবি□আ- আবু আকিল লাবিদ ইবনে রাবি□আ আল আমেরি আল মুদারি। জন্ম সাল ৫৬০ খ্রি. এবং ৬২৯ খ্রি. সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। মু□আল্লাকার কবি হিসেবে পরিচিত। মৃত্যবরণ করেছেন ৬৬১ খ্রি. সালে।

সামওয়াল- সামওয়াল ইবনে গারিদ ইবনে আদিয়া আল ইয়াহুদি। □ লামিয়্যা□ কবিতার জন্য তিনি বিখ্যাত। ৫৬০ খ্রি. সালে মৃত্যু বরণ করেছেন।

আদি ইবনে যায়েদ- আদি ইবনে জায়েদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে আয়্যুব তামিমি। কবির মৃত্যু ৫৯০ খ্রি.সালে।

উমাইয়া ইবনে আবি সলত- উমাইয়া ইবনে আবি সলত ইবনে রাবি□আ। কায়েস আইলান গোত্রের লোক। পূর্ববর্তী তাওরাত ইঞ্জিল কিতাবের উপর দক্ষতা ছিল। মৃত্য বরণ করেছেন ৬৩০ খ্রি. সালে।

খানসা- তুমাদির বিনতে আমর ইবনে শারিদ সুলমিয়্যা। উপাধি খানসা। জন্ম- ৫৭৫খ্রি. সালে। দুই ভাই মু□আবিয়া এবং সখরের মৃত্যুর শোকে মুহ্যমান হয়ে শোকগাথা রচনা করে আরবী সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেছেন। জীবনের শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মৃত্য- ৬৬৪খ্রি. সালে।[95]

95 حنا الفاخوري، **الجامع في تاريخ الأدب العربي**- الأدب القديم، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الجيل، 1986م)، ص 189، 223- 226، 241، 244، 249، 272، 280، 282، 286، 289.

ইসলামী ও উমাইয়া যুগঃ

এই যুগে দুই ধরণের কবি ছিলেন। এক. যারা ইসলামী যুগ শুরু হওয়ার পর কবি হয়েছেন। দুই. যারা জাহেলী যুগে কবি ছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও কবিতা চর্চা করতেন। উল্লেখিত দুই যুগ প্রাপ্তদেরকে ''মুখাদরামুন'' বলা হয়। কেউ আবার একইসাথে জাহেলী যুগ, ইসলামী যুগ এবং উমাইয়া যুগ তথা তিন যুগকেই পেয়েছেন। তন্মধ্যে খানসার নাম উল্লেখযোগ্য। নিচে ইসলামী ও উমাইয়া যুগের কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

কা' ব ইবনে যুহায়র (মৃত্যু - ৬৪৫খ্রি.) :

কবি কা' ব বিখ্যাত কবি যুহায়র ইবনে আবি সুলমার সন্তান। তার ফুফু সুলমা ও খানসা, সহোদর বুজায়র, পুত্র উকবা ইবনে কা' ব প্রত্যেকেই ইতিহাসের পরিচিত ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে কবিতা লিখতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামে পক্ষে কবিতা লিখেছেন।

হাসসান ইবনে সাবেত (মৃত্যু - ৬৭৪৪খ্রি.) :

কবি হাসসান খাজরাজ গোত্রের শাখাগোত্র বনু নাজ্জারে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াসরিব নগরে বেড়ে উঠায় কবিকে নগর কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে হীরা ও গাসসানীর মুনযির রাজদরবারে কবিতা বলার জন্য গমন করতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল (সা) এর পক্ষ থেকে কাফিরদের বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন।

আলী ইবনে আবি তালিব (সময়কাল- ৬০০খ্রি. - ৬৬১খ্রি.) : চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ছিলেন একাধারে একজন রাষ্ট্রপতি, একজন কবি ও দার্শনিক, পাশাপাশি যুদ্ধের ময়দানে সফল সেনাপতি।

আবু জুয়াইব আল হুজাইলি- আবু জুয়াইব খুয়াইলিদ ইবনে খালিদ আল হুজাইলি। জাহেলি যুগে কবিতা রচনা করতেন। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ২৬ হি. সালে আফ্রিকার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তারপর মিশর আগমন করেন। সেখানে কবির পাঁচ সন্তান মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সন্তানদের এমন মৃত্যুতে তিনি শোকগাথা রচনা করেন। যা পরবর্তীতে আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করে। কবির মৃত্যু- ৬৪৮খ্রি. সালে।

নাবিগা আল জা□দি- আবু লায়লা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস ইবনে জা□দা ইবনে কা□ব ইবনে রবি□আ। জাহেলী যুগ পেয়েছেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আলী (রা) এর সাথে সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইয়াযিদ, মারওয়ান ও আব্দুল মালেকের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর দলে ছিলেন। কবি ৬৯৯খ্রি. সালে ইস্পাহানে মৃত্যু বরণ করেন।

জামিল ইবনে মা□মার- পূর্ণ নাম জামিল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মা□মার। জন্মগ্রহণ করেছেন হিযাজে। চাচাত বোনের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু চাচার অসম্মতির কারণে বিয়ে করতে পারেনি। উক্ত বিচ্ছেদের ফলে কবির মনে কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। কবির মৃত্যু- ৭০১ খ্রি.সালে।

লায়লা আল আখইয়ালিয়্যাহ- সাহিত্যের ইতিহাসে নারী কবিদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন লায়লা আখইয়ালিয়্যাহ। অত্যন্ত সুন্দরী লায়লাকে ভালবেসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাওবাহ ইবনে হুমাইর। কিন্তু লায়লার বাবা উক্ত প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে বনু আদলা গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে লায়লাকে বিবাহ দেন। তাওবা ইবনে হুমাইর কোন এক যুদ্ধে নিহত হলে লায়লার ভিতরে পূর্বের প্রেম নাড়া দিয়ে উঠে এবং গভীর শোকে ভেঙ্গে পড়েন। তখন তিনি অনেক শোকগাথা রচনা করেন। উক্ত শোকগাথা কবিকে সাহিত্যজগতে স্মরণীয় করে রেখেছে। লায়লা আখইয়ালিয়্যাহ মৃত্যবরণ করেন ৬৯৫খ্রি. সালে।

কায়েস ইবনে মুলাউয়াহ- মূল নাম কায়েস ইবনে মু' আজ। প্রেমকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত। নজদের অধিবাসী। লায়লা বিনতে সা' দ নামের এক মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ও পরবর্তীতে বিচ্ছেদ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবি পাগলপ্রায় হয়ে যায়। তারপর'মাজনুন' উপাধীতে খ্যাতি লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি পথে পথে লায়লাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন এবং লায়লার নামে গান-কবিতা রচনা করেছেন।

কায়েস ইবনে জারিহ- কায়েস ইবনে জারিহ ইবনে সানাহ ইবনে হুজাফাহ আল কিনানি। লুবনা নাম্নী এক মেয়েকে ভালবেসেছে এবং বিয়ে করেছে। কিন্তু বাবার অসম্মতি ছিল উক্ত বিয়েতে। এক পর্যায়ে লুবনাকে তালাক দিয়ে কায়েস বাবার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করে। কিন্তু কায়েস লুবনার কথা কোনভাবেই ভুলতে পারছিলনা। ধীরে ধীরে সে শোকে কাতর হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমনকি এই অসুস্থতাই তাকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যায়। কবির মৃত্য হয়েছিল ৬৮৮খ্রি. সালে।

মুতাম্মাম ইবনে নুয়াইরাহ (সময়কাল ৫৩০খ্রি. - ৬৫০খ্রি.): মুখাদরাম কবির পূর্ণ নাম নাহশাল মুতাম্মিম ইবনে নুয়াইরাহ ইবনে জামরাহ ইবনে শাদ্দাদ। রিদ্দার যুদ্ধে আপন ভাই মালেক ইবনে নুয়াইরাহ যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের দলভুক্ত ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মালেক দিরার ইবনে আজওয়ার আল আসাদির হাতে নিহত হোন। উক্ত খবর মুতাম্মম এর নিকট পৌঁছালে তিনি শোকে কাতর হয়ে যান এবং শোকগাথা রচনা করেন; যা আজও আরবী সাহিত্যের বিরল সম্পদ হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে।

আর রা' ঈ- কবির মূল নাম উবাইদুল্লাহ ইবনে হুসাইন ইবনে মু' আবিয়া ইবনে জানদাল আন নুমাইরি। তার কবিতায় অনেক বেশি উটের রাখালের বর্ণনা দেয়া হয়েছে বলে তাকে 'রাখাল বা আর রা' ঈ' উপাধিতে ভূষিত হয়। কবির মৃত্যু ৭০৯খ্রি. সালে।

জু রুম্মাহ (সময়কাল ৬৯৬খ্রি. - ৭৩৫খ্রি.): মূল নাম আবুল হারেস গাইলান ইবনে উকবা আল মুদাররি। কবি ফারাযদাকের পক্ষে আর জারিরের বিপক্ষে কবিতা লিখেছেন। তার কবিতার দুধরণের বিষয়বস্তু ছিল- এক. প্রেম, দুই. মরুপ্রান্তর।

উমর ইবনে রবি' আ (সময়কাল ৬৪৪খ্রি. - ৭১১খ্রি.): আবুল খাত্তাব উমর ইবনে আবি রবি' আ আল মাখযুমি। আরবী সাহিত্যে তাঁকে প্রেমকবিদের সম্রাট বলা হয়।

আল আহওয়াস- মূল নাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আসেম আল আনসারি। তিনি দবি' আ গোত্রের লোক ছিলেন। কবি জারির ও ফারাযদাকের সমসাময়িক ছিলেন। ছোট চোখ বিশিষ্ট

হওয়ায় ' আহওয়াস' নামে পরিচিত হোন। ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালেকের শাসনামলে তাকে ' দাহলাক' দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়। পরবর্তীতে ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালেকের সময়ে কবিকে মুক্ত করা হয়। নির্বাসন জীবন থেকে কবি দামেশকে এসে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই ৭২৩খ্রি. সালে মৃত্যবরণ করেন।

ওয়ালিদ ইবনে ইয়াযিদ- আবুল আব্বাস ওয়ালিদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান। কবিতা এবং বাদ্যযন্ত্রে অনেক দক্ষ ছিলেন উমাইয়া পরিবারের এই রাজপুত্র। জন্ম ৭০৭খ্রি. সালে। শাসন ক্ষমতা হাতে নেন ৭৪৩ খ্রি. সালে। ৭৪৪খ্রি. সালে নু' মান ইবনে বশিদের রাজপ্রাসাদে নিহত হোন।

ইমরান ইবনে হিত্তান- ইমরান ইবনে হিত্তান আসসাদয়িসি আশ শাইবানি আকিদা সম্পর্কিত কবিতা লিখতেন। কবি খারেজিদের সহযোগী ছিলেন। হাজ্জাজ এবং আব্দুল মালেক কবিকে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু কবি সিরিয়া ও উমানে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। অবশেষে কুফায় ৭০৭ খ্রি. সালে মৃত্যুবরণ করেন।

কুমইয়াত ইবনে যায়েদ- কবির জন্ম কুফা নগরিতে। শি' আ আকিদার উক্ত কবি তার কবিতার মাধ্যমে বিভিন্ন তর্ক, বিতর্ক, মতামত উপস্থাপন করতেন । তার মৃত্যু ৭৪৩খ্রি. সালে।

উবাইদুল্লাহ ইবনে কায়েস- বনু আমের গোত্রের উক্ত কবিকে উমাইয়া আমলে কুরাইশদের কবি হিসেবে ভূষিত করা হতো। কবির তিনজন প্রেমিকার মধ্যে একজনের নাম রুকাইয়্যাহ হওয়ায় কবির উপাধি রুকাইয়্যাত (রুকাইয়্যাগণ) দেয়া হয়েছে। কবির মৃত্যু ৭০৪খ্রি. সালে।

আদ্দি ইবনে রিকা' - আদ্দি ইবনে যায়েদ ইবনে মালেক ইবনে রিকা। তার অধিকাংশ কবিতা আকিদা বিষয়ক হলেও তিনি উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের দরবারী কবি ছিলেন। জারিরের নিন্দা করে কবিতা লিখতেন। কবি মৃত্যুবরণ করেছেন ৭১৪ খ্রি. সালে।

আখতাল (সময়কাল ৬৪০ খ্রি. - ৭১০খ্রি.) : মূল নাম আবু মালেক গিয়াছ ইবনে গওছ ইবনে ছলত। ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তার জন্য তাকে ' আখতাল' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তিনি খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন। উমাইয়া যুগের সামাজ ও রাজনীতির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তার কবিতায় ফুটে উঠে। আরবী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ ' নাক্বায়েদ' এর তিনজনের একজন হলেন কবি আখতাল।

ফারাযদাক (সময়কাল ৬৪১খ্রি. - ৭৩২খ্রি.) : মূল নাম আবু ফেরাস হাম্মাম ইবনে গালিব ইবনে ছ' ছ' আহ। তিনি তামিম গোত্রের লোক ছিলেন। জন্মগ্রহণ করেছেন বসরায়। রাজনৈতি ও সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব দিয়ে রঞ্জিত তার কবিতা। উমাইয়া রাজদরবারে কবি কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তবে তার কবিতার মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের তুলনায় গোত্রীয় ব্যাপার বেশি ছিল। আরবী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ ' নাক্বায়েদ' এর তিনজনের একজন হলেন কবি ফারাজদাক।

জারির (সময়কাল ৬৫৩ খ্রি. - ৭৩৩ খ্রি.) : আবু হাজারাহ জাবির ইবনে আতিয়্যাহ ইবনে হুজায়ফা। জন্মগ্রহণ করেছেন ইয়ামামায়। তার গোত্র ছিল বনু তামিম। কৃপণতার জন্য কবি ও কবির পুরো পরিবার

আরবে সমালোচিত হতেন। তিনি তার কবিতায় রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে স্থান দিয়েছেন। আরবী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ ' নাক্বায়েদ' এর তিনজনের একজন হলেন কবি জারির।

তাছাড়াও আরো অনেক প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। যেমন: রুবা ইবনে আজ্জাজ, কুতামি, মি'আন ইবনে আওস, আবু মিহজান আস সাকাফি, আবুল আব্বাস আল আ' মা, আ' শা রবি' আ, নাবিগা ইবনে শাইবান, ইসমাঈল ইবনে ইয়াসার প্রমুখ।[96]

আব্বাসী যুগ

বাশশার ইবনে বুরদ (সময়কাল ৭১৪ খ্রি.-৭৮৪ খ্রি.) : সংস্কারপন্থী কবি বাশশার জন্মান্ধ ছিলেন। তিনি উমাইয়া ও আব্বাসী উভয় যুগ পেলেও আব্বাসী যুগেই তার কাব্য প্রতিভা প্রকাশ পায়। বংশগতভাবে তিনি ছিলেন পারসিক। প্রশংসা, নিন্দা, প্রজ্ঞা, বীরত্ব ও শোকগাথা সহ কাব্যের সকল শাখায় তার সরব পদাচারণা রয়েছে। [97] প্রথম দিকে কবির মু্তাযিলা আদর্শের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরবর্তীতে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে তিনি অস্বীকার করেছেন।[98]

আবু নুয়াস (সময়কাল ৭৬২খ্রি.- ৮১৫খ্রি.): মূল নাম আলী আল হাসান ইবনে হানী আল হাকামি। ইয়ামেন এর রাজবংশ যু নুয়াসের নামানুসারে কবির এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবিকে আবু নুয়াস' নামে নামকরণ করেন। পিতা-মাতা উভয়দিক থেকে কবি পারসিক বংশোদ্ভূত ছিলেন।[99] আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথমে যখন বিলাসিতা, অনৈতিকতা, মদ আর গান-বাজনার সয়লাব হয়েছিল তখনই আবু নুয়াস বেড়ে উঠে। বসরা, কুফা ও বাগদাদের মদ্যশালাগুলোতে ছিল আবু নুয়াসের বিচরণ। মদ নিয়ে আবু নুয়াসের বিখ্যাত কবিতা আরবী সাহিত্যকে যুগ যুগ ধরে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। [100]

আবুল আতাহিয়া (সময়কাল ৭৪৮ খ্রি.- ৮২৬খ্রি.): মূল নাম ইসমাঈল ইবনে আল কাসিম ইবনে সুয়ায়দ। উপনাম আবু ইসহাক। কবি দারিদ্রের কারণে কুফার জ্ঞানীগুণী ও সাহিত্যিকদের মজলিসে গমন করতে পারেনি, তাই শাসকশ্রেণী ও ধনীদের প্রতি একধরণের বীতশ্রদ্ধ ভাব তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীতে কবি বাগদাদে গমন করে এবং খলিফার প্রশংসা করে নিজের জীবনে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনেন। তখন কবি রাজপ্রাসাদের আতবা নাম্নী এক দাসীকে প্রেমের প্রস্তাব দেন। কিন্তু আতবা কবির প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করায় কবির জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। তারপর থেকে কবি প্রশংসা প্রনয়গীতি বাদ দিয়ে ধর্মীয় কবিতা লিখা শুরু করেন।[101]

আবু তাম্মাম (সময়কাল ৭৯৬খ্রি. - ৮৪৩খ্রি) : হাবিব ইবনে আওস ইবনে হারিস আত- ত্বায়ী। সিরিয়ার জাসিম নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যচর্চা শুরু করার পর খলিফা মু' তাসিম কবির খ্যাতি শুনে

96 حنا الفاخوري، المصدر السابق، ص 401 – 489.

97 আবুল ফারাজ আল আস্পাহানী, অধ্যাপক সামীর জাবির সম্পা., আল আগানী, ২য় সং (বৈরুত: দারুল ফিকর), খ. ৩, পৃ. ১৩২।

98 ড. শাওকী দায়ফ, আল ফান্নু ওয়া মাজাহিবুহু ফিশশি'রিল আরবী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ২০০৮), পৃ. ১৩৫।

99 আহমদ হাসান আয যায়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরাবী, ৬ষ্ঠ সং (বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ, ২০০০), পৃ. ১৯৮।

100 আবু নুয়াস আল হাসান ইবনে হানী, দীওয়ানু আবী নুয়াস, আহমাদ আব্দুল মাজিদ সম্পা. (বৈরুত: দারুল কিতাব আল আরবী, ১৯৮২), পৃ. ৭।

101 ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯১।

www.nagorikpathagar.org

কবিকে ডেকে পাঠান এবং প্রাসাদ কবির মর্যাদা দেন। প্রসিদ্ধ সংকলন গ্রন্থ ' দিওয়ানে হামাসা' ও ' আল ওয়াহশিয়্যাত' কবির মেধার স্বাক্ষর বহন করে। 102

আল- বুহতুরী (সময়কাল ৮২১খ্রি. - ৮৯৭খ্রি.) : মূল নাম উবাদা আল ওয়ালিদ ইবন ইয়াহইয়া আল বুহতুরী আত ত্বায়ী। শৈশবে বেদুঈনী ভাষা- সংস্কৃতি এবং পরিণত বয়সে হিমস শহরের প্রভাব কবির মধ্যে নগর ও মরুজীবনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে। আর্থিক অভাবের কারণে অনেকের মত আল বুহতুরীও বাগদাদের খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল এর রাজদরবারে গমন করেন।103

ইবনুর রুমী- হাসান আলী ইবনে আব্বাস ইবনে জারজিজ। পিতার দিক দিয়ে পারসিক বংশোদ্ভূত। জন্ম- ৮৩৫খ্রি. সালে। মৃত্যু- ৮৯৬খ্রি. সালে।104

তাছাড়াও আরো যেসকল কবিরা আব্বাসী যুগে কবিতা লিখে প্রসিদ্ধ হয়েছেন-

ইবনে মু' তায- আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনে ইবনে মু' তায ইবনে মুতাওয়াক্কিল। তিনি একদিন একরাতের জন্য খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সময়কাল- ৮৬১খ্রি. থেকে ৯০৮খ্রি. সাল।

দি' বিল- দি' বিল ইবনে আলি ইবনে রযিন আল খুযা' ই আল আযদি। জন্মগ্রহণ করেছেন কুফায় ৭৬৫ খ্রি. সালে। মৃত্যুবরণ করেছেন ৮৬০খ্রি. সালে।

আবুত তইয়্যেব আল মুতানাব্বি- মূল নাম আবুল হাসান আলী ইবনে আব্বাস ইবনে জুরাইজ। ৮৩৫খ্রি. সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার মৃত্যু ৮৯৬খ্রি. সালে।

আবু ফারাস আল হামাদানি- মূল নাম সাঈদ ইবনে হামাদান। খলিফা মুকতাদিরের সময়ে মসুলের একজন গভর্ণর ছিলেন। সময়কাল ৯৩২খ্রি. - ৯৬৮খ্রি. সাল।

শরিফ আর রদি- মূল নামআবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন। ৯৭০খ্রি. সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেছেন। মৃত্যু ১০১৬খ্রি. সালে। গর্ব, প্রেম, প্রশংসা, শোকগাথা ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা লিখেছেন।

আবুল আলা আর মা' আররি- হিমস ও আলেপ্পোর মাঝামাঝি এলাকা ' মা' আররি নু' মান' নামক স্থানে ৯৭৩খ্রি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে বসন্ত রুগে আক্রান্ত হয়ে চিরঅন্ধ হয়ে যান। মা'আরবি হতাশা ও সংশয়বাদী কবি ছিলেন।

102 حنا الفاخوري، المصدر السابق، ص 731.

103 المصدر السابق، ص 742.
104 المصدر السابق، ص757.

ইবনুল ফারিদ- আবু হাফস ওমর ইবনে আলি আস সা' দি। কায়রোতে ১১৮১খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। কবি সুফিবাদ ও বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় বহুবছর জনবিচ্ছিন্ন ও একাকি অবস্থায় দিনাপাত করেছেন। মৃত্যু- ১২৩৪খ্রি. সাল।

আল বাহা যুহাইর- আবুল ফজল বাহাউদ্দিন যুহাইর ইবনে মুহাম্মদ আল মুহাল্লাবি। মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছেন। বেড়ে উঠেছেন মিশরে। সময়কাল ১১৮৫খ্রি. - ১২৫৮খ্রি. সাল।

কুশাজিম- মূল নাম আবুল ফাতাহ মাহমুদ ইবনে হুসাইন শাহেক। তার পূর্বপুরুষ হিন্দুস্থানী ছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। তার মৃত্যু ৯৭০খ্রি. সালে।

সিররি আর রফা- আবুল হাসান সিররি ইবনে আহমদ ইবনে সিররি আল কিনদি। মসুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রশংসা, নিন্দা, শোকগাথার উপর কবিতা লিখেছেন। মৃত্যু- ৯৭৬খ্রি. সাল।

আল বুসতি- আবুল ফাতাহ আলি ইবনে হুসাইন ইবনে আব্দুল আজিজ আল বুসতি। জন্ম সিজিস্তানের নিকবর্তী এলাকা বুসতে। মৃত্যু ১০১০খ্রি. সালে বুখারায়।

মিহইয়ার আদদাইলামি- আবুল হাসান মিহইয়ার ইবনে মারযুইয়াহ আল ফারিসি আদ দাইলামি। বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রথম দিকে অগ্নিপূজক ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। মৃত্যু ১০৩২খ্রি. সাল।

আত তুগরাঈ- আবু ইসমাঈল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ। ইস্পাহানে পারসিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। সময়কাল ১০৬৩খ্রি. - ১১২০খ্রি. সাল।

আল ওয়াওয়া আদদিমাশকি- আবুল ফারাজ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল গাসসানি আদদিমাশকি। তিনি তার ঘরে ফলচক্রের আয়োজন করতেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন। কবির মৃত্যু- ৯৯৯খ্রি. সাল।[105]

আন্দালুসীয় বা স্পেনীয় কবিগণ:

আল গাজ্জাল- ইয়াহইয়া ইবনে হাকাম। কবি জাইয়ানে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পড়াশোনা করেছেন কর্ডোবাতে। সময়কাল- ৭৭২খ্রি. - ৮৬৪খ্রি. সাল।

ইবনে হানি- আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে হানি আল আযদি। ইশবিলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছেন। সময়কাল ৯৩৮খ্রি. - ৯৭৩খ্রি. সাল।

আল মু' তামাদ ইবনে আব্বাদ- বনু আব্বাদ ১০৩১খ্রি. সাল থেকে ১০৯১খ্রি. সাল পর্যন্ত আন্দালুসের ইশবিলিয়ার শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেছেন। তাদের সর্বশেষ আমির ছিলেন মু' তামাদ ইবনে আব্বাদ (১০৬৮খ্রি. - ১০৯১খ্রি.)। মু' তামাদের জন্ম ১০৪০খ্রি. সালে। রাজকীয় অবস্থায় দিনাপাত করার সময়

105 المصدر السابق، ص 721، 737، 757، 784، 819، 832، 843، 859، 861، 867، 869، 870، 872.

www.nagorikpathagar.org

আব্বাদের কবিতা আরাম, আয়েশ, মদ ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ ছিল কিন্তু শেষ দিকে বন্দী ও নিঃস্ব জীবন আব্বাদের কবিতার বিষয়বস্তুকে দুঃখ- বেদনা- যাতনায় রূপ দেয়।

ইবনে যায়দুন- আবু ওয়ালিদ আহমদ ইবনে আব্দুল্লাজ ইবনে যায়দুন। কর্ডোবার সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। কর্ডোবার বিখ্যাত আলেম ও খ্যাতনামা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইবনে যায়দুন ফিকহ, নাহু, কোর' আন, হাদীস, ইতিহাস, সাহিত্য- সংস্কৃতি সহ জ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। সময়কাল ১০০৩খ্রি. - ১০৭১খ্রি. সাল।

মরক্কোর কবিগণ-

তাছাড়াও তৎকালিন সময়ে মরক্কোতে অনেক প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন- ইবনে খফাজা, ইবনে সাহল, ইবনে যুহর, ইবনে হাব্বুস, মালিক ইবনে মিরহাল, ইবনে তাইয়্যিব আল আলামি।[106]

পতন যুগ বা তুর্কী যুগ

আশ- শাব আজ জরিফ - মূল নাম মুহাম্মদ ইবনে সালমান। কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বড় হয়েছেন দিমাশকে। প্রেমের কবি আশ শাব সেখানে রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্বপালন করেছেন। সময়কাল ১২৬৩খ্রি.- ১২৯৫খ্রি. সাল।

আল বুসুরি- মূল নাম আরিফ বিল্লাহ শারফুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ। বুসির নামক স্থানে ১২১২খ্রি.সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। হস্ত লিখনে দক্ষ ছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদেও দায়িত্বপালন করেছেন। রাসূল (সা) এর প্রশংসা করে কবি লিখে আরবী সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি। যে কবিতাটি কাসিদা বুরদাহ নামে পরিচিত। বিখ্যাত এই কবি মৃত্যুবরণ করেছেন ১২৯৬খ্রি.সালে আলেকজান্দ্রিয়ায়।

ইবনুল ওয়ারদি- যাইনুদ দিন ওমর। ১২৮৯খ্রি.সালে মাআররি নুমানে নামক স্থানে আরবী সাহিত্যের চরম অধপতনের সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। কবির মৃত্যু সন ১৩৪৮খ্রি.।

সফিউদ্দিন হিল্লি- আব্দুল আজিজ ইবনে সারায়া ইবনে আলী ইবনে আবিল কাসিম আত-তাঈ। কুফা ও বাগদাদের মাঝামাঝি শহর হিল্ল নাম স্থানে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে উঠেছেন। পেশায় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসায় সূত্রে বিভিন্ন দেশে গমন করতেন। সুযোগে তিনি বিভিন্ন দেশের রাজদরবারে বাদশার প্রশংসা করে উপঢৌকনও লাভ করেছেন। তন্মধ্যে মিশরের সুলতাম নাসিরুদ্দিন কালউন এর প্রশংসায় নাসিরাত কবিতা আজও সাহিত্যের পাতাকে মূল্যবান করে রেখেছে।

ইবনে নুবাতাহ - আবু বকর জামালুদ্দিন আর কারশি। মিশরে বড় হয়েছেন। পরবর্তীতে দিমাশকে প্রস্থান পূর্বক বাদশা মুয়ায়্যিদ এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এক পর্যায়ে কবি বাদশাহের ব্যক্তিগত লেখকের মর্যাদ পান । মিশরের

106 المصدر السابق، ص 960، 961، 966، 969.

সুলতান হাসান কবিকে রাজদরবারের লেখক হিসেবে চেয়েছিলেন , কবিও সুলতানের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন কিন্তু ইত্যবসরে সুলতান মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে নুবাতার সময়কাল **১২৮৭খ্রি.- ১৩৬৬খ্রি.**সাল।[107]

আধুনিক যুগ

১৭৯৮খ্রি. সাল থেকে এখন পর্যন্ত যারাই আরবী কবিতা চর্চা করছে সবাই আরবী সাহিত্যে আধুনিক কবিদের অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে নিচে প্রসিদ্ধ কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো-

বদর শাকের সাইয়্যাব- কবি দক্ষিণ ইরাকের বসরাতে **১৯২৬**খ্রি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। আরবী সাহিত্যে মুক্তছন্দ কবিতার ক্ষেত্রে তার কৃতত্ব রয়েছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ইরাক স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান রাখতে **১৯৪৮**সালে তিনি বাম রাজনীতিতে যোগ দেন। কবি বসরাতে **১৯৬৪**খ্রি. সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সালাহ আব্দুস সবুর - তার আসল নাম মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন আব্দুস সবুর আল হাওয়াতিকি। জন্ম **১৩** মে **১৯৩১**, জাকাজিক শহরে। আধুনিক ছন্দমুক্ত আরবি কবিতার পথিকৃত। পাশ্চাত্য স্টাইলে প্রতীকধর্মী আরবি কবিতার সফল যাত্রা শুরু তার হাতেই। আরবি নাটক নির্মাণ ও ছন্দমুক্ত কবিতা রচনা করে বিশেষভাবে যারা খ্যাতিমান তিনি তাদের অন্যতম। সময়কাল **১৯৩১**খ্রি.-**১৯৮১**খ্রি. ।[108]

মাহমুদ দারবিশ- মাহমুদ দারবিশ জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৪২ সালে, ফিলিস্তিনের এক অখ্যাত গ্রাম ' আল-বোরোতে' । ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলী সৈন্যদের ফিলিস্তিন দখলের সময়, এক ভয়াবহ রাতে আক্রান্ত হয় দারবিশের এই ছোট্ট গ্রামটিও। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় দারবিশের পরিবার। ইসরায়েলী সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তারা প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা লুকিয়ে ছিলেন ক্ষেতের মাঝে। পরে শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নেন লেবাননে। এক বছর পর, সাত বছর বয়সে, দারবিশ লেবাননের সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করেন ফিলিস্তিনে, তার হারানো জন্মভূমিতে। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে মৃত্যুবরণ করেন।[109]

আহমদ শাওকি- ১৮৬৮খ্রি. সালে মিশরের বাবে ইসমাঈল নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। মিশরের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের দ্বারা কবি প্রভাবিত ছিলেন। কবির মৃত্যু **১৯৩২**খ্রি. সাল। তাকে কবি সম্রাট বলা হয়।[110]

মিখাইল নু' আইমা- ১৮৮৯খ্রি. সালে লেবাননে জন্মগ্রহণ করেন। **১৯১১**খ্রি. সালে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করেন। পরবর্তীতে **১৯৩২**সালে নিজ দেশ লেবাননে ফিরে আসা পর্যন্ত প্রবাসি কবিদের সংগঠন

107 المصدر السابق، ص 1046، 1048، 1049، 1050.

108 ড. কামরুল হাসান, " প্রতীকধর্মী আরবি কবিতার সফল কবি সালাহ আব্দুস সবুর ", **দৈনিক সংগ্রাম-অনলাইন**, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬, http://www.dailysangram.com।

109 "محمود درويش" ، **الجزيرة، http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/20.**

110 أحمد تمام، " أحمد شوقي.. أمير الشعراء"، **أرشيف إسلام أون لاين،** https://archive.islamonline.net.

'রাবিতা আল কলামিয়্যা'র সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৮৮খ্রি. সালে মৃত্যুবরণ করেন।111

ইলিয়া আবু মাদি- সময়কাল ১৮৮৯খ্রি. - ১৯৫৭খ্রি.। লেবাননে জন্ম নেয়া এই কবি ১৯০২ জীবিকার তাগিদে চাচার সাথে মিশর গমন করেন। সিগারেট ব্যবসার পাশাপাশি পড়াশোনা ও লেখালেখি শুরু করেন। ১৯১১ সালে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিজকারুল মাদি' প্রকাশিত হয়। সরকার ও রাজনীতি নিয়ে কবিতার লেখার কারণে ১৯১২খ্রি. সালে তিনি মিশর ছেড়ে আমেরিকা গমন করতে বাধ্য হোন। সেখানে দেশত্যাগী কবিদের সংগঠন 'রাবিতা আল কলামিয়্যা' এর সদস্য হোন।

আব্দুর রহমান শুকরি- সময়কাল ১৮৮৬খ্রি. - ১৯৫৮খ্রি.। মিশরের পোর্ট সাঈদ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। মিশরে ইংরেজ সৈন্যদের কর্তৃক 'দিনশাওয়া ট্র্যাজেডি' ঘটার পর তিনি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান করেন।

হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহিম- ১৮৭২খ্রি. সালে মিশরের আসইয়ুত এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রখর মুখস্তশক্তির কারণে তিনি হাফেজ উপাধিতে পরিচিত লাভ করেন। নীল নদের নৌকার পাটাতনে জন্ম হওয়ায় তার আরেক উপাধি 'নীল নদের কবি'। তিনি ১৯৩২খ্রি. সালে কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন।

মা'রুফ রুসাফি- সময়কাল ১৮৭৫ খ্রি. - ১৯৪৫খ্রি.। ১৯২০খ্রি. সালে ইংরেজরা যখন ইরাক দখল করে তখন বিদ্রোহী জনসাধারণের সাথে কবি রুসাফিও রাস্তায় নেমে আসেন এবং তার কবিতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। পেশাগত দিক দিয়ে কবি আমৃত্যু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করেছেন।

জিবরান খলিল জিবরান- সময়কাল ১৮৮৩খ্রি. - ১৯৩১খ্রি.। দেশত্যাগী কবিদের সংগঠন 'রাবিতা আল কলামিয়্যা' এর সভাপতি ছিলেন লেবাননে জন্ম নেওয়া এই কবি। আন-নাবিয়্যু কবিতা লিখে খ্যাত হয়ে আছেন আরবী সাহিত্যে। ১৮৯৫খ্রি. সালে শৈশবে মায়ের সাথে আমেরিকায় গমন করেন। ১৯৩১খ্রি. সালের এপ্রিলে আমেরিকাতে মৃত্যু বরণে করেন। তবে তার ইচ্ছা অনুযায়ী পরবর্তীতে ১৯৩২খ্রি. সালে নিজ দেশ লেবাননে পুনরায় দাফন করা হয়।

নাযিক আল মালাইকা- সময়কাল ১৯২৩খ্রি. - ২০০৭খ্রি.। আবরী সাহিত্যে মুক্ত ও গদ্য ছন্দের অগ্রদূত বলা হয় ইরাকী এই কবিকে। কর্মজীবনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। গদ্যে ছন্দে লেখা ৪৪৪ লাইনের 'কলেরা' কবিতাটি কবিকে আরবী সাহিত্যে স্মরণীয় করে রাখবে।

তাছাড়াও মাহমুদ সামি আল বারুদি, আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, বইরাম তুনুসি, নাসিব আরসালান, মুজাফফর আন নাওয়াব, মুহাম্মদ মাহদি আল জাওয়াহিরি, বাদাবি জাবাল, আস'আদ আল জাবুরি, আহমদ দাহবুর, আহমদ যাইন, ওমর আবু রিশা, ইব্রাহিম তুকান, মুহাম্মদ খাইরুদ্দিন, গদাহ সিমান,

111 تسنيم معابرة ، "تعريف ميخائيل نعيمة"، **موضوع**، https://mawdoo3.com.

www.nagorikpathagar.org

ইয়াসমিন আইয়্যুবি, ইয়াসিন আবদ রিফা' ইয়াহ, আহমদ সফি নাজাফি, সলাহ আব্দুস সবুর, আখতাল সগির, জিব্রা ইব্রাহিম জিব্রা, নাযযার কিবানি, মাজজুব আব্দুল কারিম, সাঈদ কারমি, ইলিয়াস লুহুদ, আযিয আবাজাহ, ইব্রাহিম ইয়াজিযি, খলিল মুতরান, আহমদ মুতার, হামযাহ কানায়ি, মিশাল ত্বরাদ, আমিন নাখলাহ, বুলস সালমা, ইলিয়াস ফারহাত, ইলিয়াস আবু শাবাকাহ, আলি মাহমুদ ত্বহা, ইব্রাহিম নাজি, ইউসুফ ইজ্জুদ্দিন, মুহাম্মদ আব্দুহু, ইব্রাহিম আব্দুল কাদির আল মাযিনি, শাওকি বাজিগ, লামি' আ ইমারহ, খলিল মুতরান প্রমুখ কবিগণ আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।[112]

৪.৩. কবি-সাহিত্যিক ও রাজা-বাদশাহের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ

কবি-সাহিত্যিক ও রাজা-বাদশাহের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত সম্পর্ক হলো- কবিরা কবিতা বলার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে রাজদরবারে যাতায়াত করত অপরদিকে রাজা-বাদশাহরা কবি-সাহিত্যিকদেরকে মুখে কিছু প্রশংসা শুনে আত্মতৃপ্তি পেতেন। সহজভাষায় বললে কবিদের লাভ হচ্ছে কিছু অর্থ আর রাজাদের লাভ হলো নিজের কিছু প্রশংসা শ্রবণ করা। তবে এক্ষেত্রে শুধু নিজের প্রশংসাই নয় বরং বিরোধী বা শত্রুপক্ষের নিন্দাও রাজারা কবিদের মুখ থেকে শুনতে পেতেন।

রাজ দরবারের তত্ত্বধায়নে রাজ্যের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সমাদর করার ইতিহাস যুগ যুগ ধরে। আজও বিদ্যমান আছে। রাজ্যের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে জ্ঞানপিপাসুরা জাতির জন্য অনেক কিছু করার সুযোগ পান। প্রত্যেক যুগেই শাসকরা জ্ঞানী-গুণী, কবি সাহিত্যকদের সর্বদা পাশে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পার্থক্যের বিষয় হলো- জ্ঞানীদেরকে কিভাবে বা কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচেছ। জনগণের সামনে সর্বদা শাসকের ভাল গুণাবলী ফুটিয়ে তুলতে এবং মন্দগুণাবলীকে ঢাকা দিতে কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণীরা শাসকের পক্ষে কাজে লাগতে পারে। কোন শাসক তার শাসন ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে রাজ্যের জ্ঞানীদের পরামর্শদানকারী হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। যদিও এতে রাজ্যের সাধারণ স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। কেবল শাসকের নিজের স্বার্থই উদ্ধার হোক আর প্রজাদের জীবনে নেমে আসুক দুর্বিষহ এটা সব জ্ঞানী-গুণী, সাহিত্যিকরা মেনে নিতে পারেনা। তখন দেখা যায়, একদল শাসকের অনুগত হয় অন্যদল শাসকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। অন্যায় হওয়া সত্ত্বেও যারা শাসকের পক্ষে অবস্থান নেয় তারা সাময়িক সময়ের জন্য হলেও রাজ্যের অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হোন। আর বিপরিত পক্ষে যারা শাসকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তাদের জীবনে নেমে আসে চরম অত্যাচার-নিপীড়ন। এমনকি মৃত্যুদণ্ডও হয়েছে বহু কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির শাসকের নিন্দা বা বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার অপরাধে। সুতরাং ইহা খুব স্পষ্ট করেই বলা যায়, কবি-সাহিত্যিকের সাথে রাজা-বাদশাহের সম্পর্ক যেমন গলায় গলায় হতে পারে তেমনি উভয় পক্ষের মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্ক তৈরি হওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

৪.৪. সাহিত্যকর্মে রাজনৈতিক ছাপ

112 "شعراء العصر الحديث"، **الحكواتي** ، http://al-hakawati.la.utexas.edu.

www.nagorikpathagar.org

যে কোন সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে একটি প্রেষণা কাজ করে। এই প্রেষণাই মূলত একজন সাহিত্যিকের মনে নতুন কিছু সৃজন করার জন্য জন্য উদ্বুদ্ধ করে। বিভিন্ন পরিস্থিতির আলোকে মনের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রেষণার উদ্ভব হয়। কোন ব্যক্তির জীবনে অনেক অভাব-অনটন একধরণের প্রেষণা তৈরি করে। এই প্রেষণার ফলে তার মস্তিষ্ক থেকে হতাশাব্যঞ্জক সাহিত্য সৃষ্টি হবে। কেউ তার জীবনে অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে। উক্ত অত্যাচারিত ব্যক্তির মনে সর্বদা ঘৃণা ও ক্ষোভ বিরাজ করে। সে যখন কোন সাহিত্য লিখবে তখন মনের ভিতর জমে থাকা ঘৃণা আর ক্ষোভ তার সাহিত্যকর্মে প্রভাব বিস্তার করবে। তেমনিভাবে নিরাপত্তা, আরাম আয়েশের জীবন যাপন ব্যক্তিকে একধরণের প্রেষণা দেয়। সর্ব অবস্থায় মানুষের মনে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি জাগ্রত হয়; অনুভূতিশূন্য হয়ে কখনো মানুষ বাঁচতে পারেনা। আরো সহজ করে বলা যায়, শৈশবে বাবা মারা যাওয়ার পর ইয়াতিম শিশু অভাব অনটনে পিষ্ট হওয়াতে তার মনে যেমন একধরণের অনুভূতি তৈরি হয় ঠিক তেমনি জন্ম থেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত পিতৃস্নেহে বেড়ে উঠা ব্যক্তির মনেও একধরণের অনুভূতি তৈরি হয়। দুব্যক্তির অনুভূতি সম্পূর্ণ বিপরিত হলেও উভয় ধরণের অনুভূতিই একজন মানুষের মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেষণা যোগাতে সক্ষম। এমনকি উভয় অনুভূতি থেকে সৃষ্ট সাহিত্য মানের দিক দিয়েও সমান হতে পারে। গবেষণার শিরোনাম ও বিষয়বস্তুর আলোকে আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ও তৎকালীন রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ধরণ পরিবর্তন হয়েছে। জাহেলী যুগের কবি সাহিত্যিকরা তার নিজের গোত্রের পক্ষে ও অন্য গোত্রের কুৎসা রটনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইসলামী যুগে মুসলিম কবিরা অমুসলিম কবি সাহিত্যিকদের সমালোচনা করে পরিচিতি পেয়েছে। উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে রাজপ্রাসাদে দিন-রাত রাজা-বাদশহের প্রশংসামূলক কবিতা লিখে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। অপরদিকে আধুনিক যুগে অনেক প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিকরা রাষ্ট্রের বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদীদের সমালোচনা, স্বাধীনতার পক্ষে কবিতা লিখে মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ধরণের মধ্যে রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের উদাহরণ বিভিন্ন যুগের প্রসিদ্ধ পদ্যসাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে পেশ করা হলো।

জাহেলী যুগঃ

জাহেলী যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা যেহেতু গোত্রীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হত তাই তৎকালীন সময়কার রাজনৈতিক অস্থিরতা, ঘাত-প্রতিঘাত বলতেই গোত্রীয় দ্বন্দ্বকে বুঝায়। কবিরা মদ, নারী, প্রেম, উট, ইত্যাদি বিষয়ক কবিতা লিখার পাশাপাশি নিজ বংশীয় গৌরব এবং অন্য বংশের নিন্দা করে কবিতা লিখতেন। উক্ত গোত্র বিষয়ক কবিতাসমূহকে মূলত তখনকার রাজনৈতিক কবিতা বলা যায়। জাহিলী সাহিত্যের বিশাল অংশজুড়ে স্থান করে আছে এসব রাজনৈতিক কবিতা। এক্ষেত্রে ইমরাউল কায়েসের (সময়কাল-আনু. ৪৯৭-৫৪৫খ্রি.) এর কবিতা অন্যতম। রাজপরিবারের সদস্য হওয়ায় প্রথম জীবনে কবি মদ, নারী, ভোগ-বিলাশ ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা লিখতেন। পরবর্তীতে বনু আসাদ গোত্র কর্তৃক তার বাবা নিহত হওয়ার পর তার কবিতার বিষয়বস্তু প্রতিবাদ, নিন্দা ও কুৎসামূলক হয়ে যায়। কবি বনু আসাদ গোত্রের বিরুদ্ধে যেমন কুৎসা রটনা করে কবিতা লিখেছেন তেমনি বনু বকর ও তাগলিব গোত্রের কুৎসা রটনা

করেছেন। কেননা, বনু আসাদ গোত্রকে শায়েস্তা করার জন্য প্রথমে কবি এই দুই গোত্রের সহযোগিতা নিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে এই দুই গোত্র আর কবির সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।

গোত্রীয় রাজনীতি বিষয়ক কবিতা লিখেছেন সপ্ত ঝুলন্ত কবিতার কবি ত্বরাফা। কবি বকর ও তাগলিব গোত্রের মধ্য সংঘটিত হওয়া বাসুস যুদ্ধে বকর গোত্রের সাথে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে কবি তাগলিবিদের বিরুদ্ধে নিজেদের শৌর্য- বীর্যর কাব্যিক বিবরণ দেন।

يوم حبست النفس عند عراكه + حفاظا على عوراته والتهدد

على موطن يخشى الفتى عنده الردى + متى تعترك فيه الفرائص ترعد

তথা কতদিন যুদ্ধ ক্ষেত্রে সংকটময় মুহূর্তে ভয়ভীতি উপেক্ষা করে আক্রমণ করার জন্য আমার চিত্তকে দৃঢ় রেখেছি।

যেখানে বীর যুদ্ধাগণ মৃত্যুভয়ে শংকিত হয়, যখন তাদের স্কন্ধদেশ পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষিত হয় এবং ত্রাসে প্রকম্পিত হয়।[113]

বনু বকর ও তাগলিব গোত্রের দ্বন্ধ নিরসনে দুই গোত্র থেকে দুটি প্রতিনিধিদল হীরার রাজা আমর ইবনে হিন্দ এর নিকট গমন করেন। দুই প্রতিনিধি দলে দুজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাগলিব গোত্রে ছিলেন আমর ইবনে কুলসুম আর বকর গোত্রের দলে ছিলে হারিস ইবনে হিল্লিযা। প্রথমে আমর ইবনে কুলসুম তার গোত্রের বীরত্ব রাজদরবারে তুলে ধরেন অতপর আমরের জবাবে হারিস ইবনে হিল্লিযা তার বকর গোত্রের গৌরবগাথা বাদশাহ আমর ইবনে হিন্দের সামনে উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে দুজনের কবিতাই মুয়াল্লাকার অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথমে আমর ইবনে কুলসুমের কবিতার একাংশ উল্লেখ করা হলো-[114]

أَبَا هِنْـدٍ فَلاَ تَعْجَـلْ عَلَيْنَـا+ وَأَنْظِـرْنَا نُخَبِّـرْكَ اليَقِيْنَـا

ওহে আমর ইবনে হিন্দ! তুমি আমাদের নিয়ে খুব বেশি ব্যতিব্যস্ত হয়ো না; বরং আমাদেরকে একটু অবকাশ দাও যাতে তোমাকে তথ্যনির্ভর সংবাদ পরিবেশন করতে পারি।

بِأَنَّا نُـوْرِدُ الـرَّايَاتِ بِيْضـاً + وَنُصْـدِرُهُنَّ حُمْراً قَدْ رُوِيْنَـا

জেনে রাখ আমরা শুভ্র ঝাণ্ডাসমূহকে হাতে নিয়ে যুদ্ধে অবতরণ করি; কিন্তু প্রত্যাবর্তন কালে উহা রক্তে পরিতৃপ্ত হয়ে রক্তিম আকার ধারণ করে।

113 আ.ত.ম মুছলেহউদ্দিন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, সপ্তম সং, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৭৬।
114 " معلقة عمرو بن كلثوم ", **ling,** https://www.lingq.com.

وَأَيَّـامٍ لَنَـا غُرٍّ طِـوَالٍ+ عَصَيْنَـا المَلِكَ فِيهَا أَنْ نَدِيْنَـا

আমাদের বহু লড়াইয়ের ইতিহাস রয়েছে, যেগুলোতে আমরা কোন রাজা বাদশাহের কাছে নতি স্বীকার করি নাই।

وَسَيِّدِ مَعْشَرٍ قَدْ تَوَّجُوْهُ + بِتَاجِ المُلْكِ يَحْمِي المُحْجَرِيْنَـا

বহু গোত্রীয় নেতা রয়েছে যারা রাজমুকুটে গোরবান্বিত এবং তারা আশ্রয়প্রার্থীকে সুরক্ষা করে।

تَرَكْـنَ الخَيْلَ عَاكِفَةً عَلَيْـهِ + مُقَلَّـدَةً أَعِنَّتَهَـا صُفُـوْنَـا

আমরা ঘোড়া নিয়ে তার উপর স্থির অবস্থান নিয়েছি এবং উক্ত ঘোড়াকে তিন পায়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় লাগামের রশি লাগিয়েছি।

وَأَنْزَلْنَا البُيُوْتَ بِذِي طُلُـوْحٍ + إِلَى الشَامَاتِ نَنْفِي المُوْعِدِيْنَـا

ত্রাসসৃষ্টিকারী শত্রুদের বিতাড়রপূর্বক আমরা আমাদের গোত্রগৃহকে যীতুলহ্‌ হতে শামাত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছি।

وَقَدْ هَرَّتْ كِلاَبُ الحَيِّ مِنَّـا + وَشَـذَّبْنَا قَتَـادَةَ مَنْ يَلِيْنَـا

আমাদেরকে অস্ত্রসজ্জিত দেখে গোত্রের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে; আর আমরা আমাদের পাশ্বর্বর্তী শত্রুদের কচুকাটা করি।

مَتَى نَنْقُلْ إِلَى قَوْمٍ رَحَانَـا + يَكُوْنُوا فِي اللِّقَاءِ لَهَا طَحِيْنَـا

যদি কোন আমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে তারা যুদ্ধের যাতাকলে পেষা আটার মত বিচূর্ণ হয়ে যায়।

يَكُـوْنُ ثِقَالُهَا شَرْقِيَّ نَجْدٍ + وَلُهْـوَتُهَا قُضَـاعَةَ أَجْمَعِيْنَـا

আমাদের যুদ্ধরূপ যাঁতার থলে থাকত নাজদের পূর্ব দিগন্তে আর এর শত্রুরূপ দানা হত সমগ্র কুদ্বা’আ গোত্র।

نَزَلْتُـمْ مَنْزِلَ الأَضْيَافِ مِنَّـا + فَأَعْجَلْنَا القِرَى أَنْ تَشْتِمُوْنَـا

তোমরা আমাদের নিকট অতিথি হয়ে আগমন করেছ আর পাছে গালমন্দ কর, তাই তোমাদের দ্রুত আপ্যায়ন (হত্যা) করলাম।

قَرَيْنَاكُـمْ فَعَجَّلْنَـا قِرَاكُـمْ + قُبَيْـلَ الصُّبْحِ مِرْدَاةً طَحُوْنَـا

তোমাদেরকে যখন আপ্যায়ন করলাম, তখন ভোর হওয়ার আগে কঠিন যাঁতা দিয়েই আপ্যায়ন করলাম।

نَعُمُّ أُنَاسَنَا وَنَعِفُّ عَنْهُمْ + وَنَحْمِلُ عَنْهُمُ مَا حَمَّلُوْنَا

আমাদের গোত্রীয় লোকদের আমরা ব্যাপকহারে দান করে থাকি; কিন্তু তাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত থাকি। আর তারা আমাদের উপর যে জিম্মাদারি চাপায় তা বহন করি।

نُطَاعِنُ مَا تَرَاخَى النَّاسُ عَنَّا + وَنَضْرِبُ بِالسَّيُوْفِ إِذَا غُشِيْنَا

শত্রুদল আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকলে আমরা বর্শা দ্বারা আঘাত করি; আর যদি আমরা শত্রুপরিবেষ্টিত হয়ে যাই তাহলে তরবারি দিয়ে আঘাত করি।

بِسُمْرٍ مِنْ قَنَا الخَطِّيِّ لُدْنٍ + ذَوَابِلَ أَوْ بِبِيْضٍ يَخْتَلِيْنَا

আমরা খিত্তি নির্মিত সুতীক্ষ্ন ফলা বিশিষ্ট ধূসর বর্ণের বর্শা দ্বারা আঘাত করি কিংবা শুভ্র ধারালো তরাবারি দিয়ে আক্রমণ চালাই।

كَأَنَّ جَمَاجِمَ الأَبْطَالِ فِيْهَا+ وُسُوْقٌ بِالأَمَاعِزِ يَرْتَمِيْنَا

আমরা উক্ত তরবারি দিয়ে শত্রু মস্তকসমূহ দ্বিখণ্ডিত করি এবং তাদের ঘাড়সমূহকে কচুকাটা করি।

- তাগলিব গোত্রের পক্ষ থেকে উক্ত কবিতা বলার পর বকর গোত্র থেকে কবি হারিস হিল্লিযা তাগলিব গোত্রের প্রতিবাদে বাদশাহের দরবারে তার গোত্রের বীরত্বগাথা বর্ণনা করেন। নিচে সুদীর্ঘ কবিতার একাংশ উল্লেখ করা হলো।[115]

أَيُّهَا النَاطِقُ المُرَقِّشُ عَنَّا+ عِنْدَ عَمْرٍو وَهَلْ لِذَاكَ بَقَاءُ

ওহে অতিরঞ্জনকারী বক্তা! আমাদের ব্যাপারে আমর ইবনে হিন্দ এর কাছে যা বর্ণনা করা হয়েছে তার কোন স্থায়িত্ব আছে?

لا تَخَلْنَا عَلَى غِرَاتِك إِنَّا+ قَبلُ مَا قَد وَشَى بِنَا الأَعْدَاءُ

তোমার কানভারী করা ষড়যন্ত্রে আমাদেরকে শংকিত মনে করোনা। কেননা অতীতেও শত্রুরা আমাদের নামে কুৎসা রটিয়েছে।

فَبَقِينَا عَلَى الشَنَاءَةِ+ تَنمِينَا حُصُونٌ وَعِزَّةٌ قَعسَاءُ

115 "معلقة الحارث بن حلزة اليشكري " , **ling,** https://www.lingq.com.

লোকবিদ্বেষ সত্বেও আমাদের সগৌরব অস্তিত্ব টিকে আছে। সুদৃঢ় দুর্গ ও সমুচ্চ মর্যাদা আমাদের গৌরবকে বর্ধিত করে।

قَبلَ مَا اليَومِ بَيَّضَت بِعُيـونِ+ النَّـاسِ فِيـهَـا تَـغَيُّـظٌ وَإِبَـاءُ

ইতিপূর্বেও আমাদের আত্মগৌরব ও আত্মমর্যাদা শত্রুদের দৃষ্টিকে অন্ধ বানিয়েছে।

فَكَأَنَّ المَنونَ تَردِي بِنَا أَرعَـنَ+ جَـونـاً يَـنـجَـابُ عَـنـهُ العَمـاءُ

কালের দুর্যোগ আমাদের উপর আপতিত হয়, তা যেন কৃষ্ণ পাহাড়চূড়ায় মেঘমালা ছিড়ে যায়।

مُكفَهِراً عَلَى الحَوَادِثِ لا تَرتُوهُ+ لِـلـدَهـرِ مُـؤَيِّـدٌ صَـمَّـاءُ

উক্ত পাহাড় বিপদ আপদে সুকঠিন ও অটল; কালের মহাবিপর্যয় তাকে টলাতে পারেনা।

رمِـيٌّ بِـمِـثـلِـهِ جَـالَتِ الخَيـلُ+ فَـآبَت لِـخَـصـمِـهَـا الإِجـلاَءُ

আমর ইবনে হিন্দ ঐতিহ্যবাহী ইরাম ইবনে সাম বংশীয়, তাঁর মত রাজার সাথেই ঘোড়া চক্কর দেয়; ফলে শত্রুদের আগমণে সে উচ্ছেদ হতে চায়না।

مَـلِكٌ مُقسِطٌ وأَفضَلُ مَن يَمشِـي+ وَمِـن دُونَ مَـا لَـدَيـهِ الـثَّنَـاءُ

তিনি ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এবং মানবসেরা ব্যক্তি, তার প্রশংসা বর্ণনাতীত।

أَيَّمَـا خُـطَّـةٍ أَردتُـم فَـأَدوهَـا + إِلَـينَـا تُـشـفَـى بِهَـا الأَمـلاءُ

যে কোন গুরুতর বিষয় তোমরা সম্পন্ন করতে চাও তা তোমরা আমাদের উপর ন্যস্ত কর, আর এতে বিশিষ্টজনেরা আশ্বস্ত হবে।

إِن نَبَشتُم مَا بَيـنَ مِـلحَـةَ فَـالـ+ صَاقِبِ فِيهِ الأَموَاتُ وَالأَحَيَـاءُ

তুমি যদি মিলহা ও সাকিব এর মধ্যবর্তী স্থানে সংঘঠিত যুদ্ধের রহস্য উদঘাটন কর, তবে সেখানে বহু মৃতদেহ(তাগলিব গোত্রের) এবং অনেক জীবন্ত দেহ (বকর গোত্রের) দেখতে পাবে।

أَو نَقَشتُم فَالـنَّـقـشُ يَـجشَـمُـهُ + النَّـاسُ وَفِيهِ الإِسقَامُ وَالإِبـرَاءُ

কিংবা তোমরা যদি ছিদ্রান্বেষণ কর, যা মানুষকে কষ্ট দেয়, তবে এতে দুষ্টলোক যেমন রয়েছে তেমনি নির্দোষ ব্যক্তিও রয়েছে।

أَو سَكَتُّم عَنَّا فَكُنَّا كَمَن أَغمَضَ+ عَينـاً فِـي جَفنِـهَـا الأَقـــذَاءُ

কিংবা তোমরা যদি আমারে ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন কর তবে আমরাও অনুরূপ করব, এই ব্যক্তির মত যার চোখের পাতায় আবর্জনা পড়া সত্বেও চোখ বুঝে থাকে।

أَو مَنَعتُم مَا تُسأَلُونَ فَمَن حُـدِّ+ ثتُمُـوهُ لَـهُ عَلَينَـا العَـتَـلاءُ

কিংবা তোমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান কর তবে সে কোন ব্যক্তির কথা জেনেছ, সে আমাদের চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ হবে?

هَل عَلِمتُم أَيَّامَ يُنتَهَبُ النَّـاسُ+ غِـوَاراً لِـكُـلِّ حَـيٍّ عُـواءُ

মানুষের মাঝে ব্যাপকহারে লুঠপাট ও হানাহানির দিনগুলোতে যখন সবগোত্রে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল তখন তোমরা কি আমাদের বীরত্বের কথা অবগত হয়েছিলে?

لَيـسَ يُـنـجِـي الذِي يُوَائِل مِنَّـا+ رَأْسُ طَـوْدٍ وَحَـرَّةٌ رَجـلاءُ

আমাদের ভয়ে পলায়নকারী ব্যক্তিকে সমুচ্চ পাহাড়চূড়া (দূর্গ) এবং প্রস্তরময় পাষাণভূমি কোনোটিই রক্ষা করতে পারবেনা।

مَـلِكٌ أَضـلَـعَ البَرِيَّةِ لا يُـوجَـدُ فِـيـهَا لِـمَـا لَـدَيـهِ كِـفَـاءُ

তিনি (আমর ইবনে হিন্দ) এমন রাজাধিরাজ গোটা সৃষ্টিকুল যার পদানত; এতে তার সমতুল্য কাউকে পাওয়া যাবেনা।

জাহেলী যুগের রাজনৈতিক কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে শুধু গোত্রীয় দ্বন্দ্বই নয় বরং পরবর্তী উমাইয়া ও আব্বাসী আমলের মত রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার প্রশংসার ব্যাপারও আছে। তখনও জাজিরাতুল আরবের পাশ্ববর্তী কিছু প্রদেশ ছিল যেগুলো গোত্রীয় পদ্ধতিতে নয় বরং একজন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পুরো প্রদেশ পরিচালিত হত। এসব প্রদেশের রাজাদেরে দরবারে জাহেলী কবিরা কেউ কেউ গমন করেছেন এবং রাজাদের প্রশংসা করে কবিতা লিখে অর্থ উপার্জন করেছেন। সপ্ত ঝুলন্ত কবিতার অন্যতম কবি আ' শা নিজের ব্যাপারেই একটি কবিতায় বলেন,

عمان فحمص فأورشليم+ وطوفت للمال آفاقه
وأرض النبيط وأرض العجم + أتيت النجاشي في داره

আমি অর্থের জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি। উমান হিমস জেরুজালেম গিয়েছি। নাজাশি নাবতি আজমিদের দেশে গমন করেছি।[116]

কবিরা রাজদরবারে প্রশংসা করে উপার্জন করেছেন ঠিকই কিন্তু কাউকে আবার রাজা-বাদশাহের রোষানলে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তন্মধ্যে ইমরাউল কায়েসের নাম ও ত্বরাফার নাম উল্লেখযোগ্য। বনু আসাদ গোত্রের দূত ইমরাউল কায়েসের বিরুদ্ধে রোম বাদশাহ্ কায়সারের নিকট কুৎসা রটিয়ে দেন- ইমরাউল কায়েস বাদশাহের মেয়েকে নিয়ে অশ্লীল কবিতা লিখেছে। উক্ত অভিযোগের ফলে কায়সার ইমরাউল কায়েসের জন্য একটি বিষযুক্ত পোষাক উপহার পাঠান। এই পোষাক পরিধান করার পরই বিষক্রিয়ায় ইমরাউল কায়েস মৃত্যুবরণ করেন।

অপরদিকে অভাবে পিষ্ট ত্বরাফা হীরার রাজা আমর ইবনে হিন্দের দরবারে কবিতা বলে অর্থ উপার্জন করতে যান। নিন্দা করতে অভ্যস্ত কবি ত্বরাফা বাদশাহের সামনেই বাদশাহের নিন্দা করে বসেন। তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। উক্ত নিন্দাবাচক কবিতার দুটো লাইন এমন ছিল-

فليتَ لنا، مَكانَ المَلْكِ عَمْرٍو + رغوثاً حولَ قُبّتِنَا تخورُ

لعمركَ إنَّ قابوسَ بنَ هندٍ + لَيَخْلِطُ مُلْكَهُ نُوكٌ كثيرُ

তথা আমাদের তাবুর আশে পাশে রাজা আমর ইবনে হিন্দের পরিবর্তে দুগ্ধবতী মাদী ভেড়ার অবস্থান আমাদের জন্য কতই না উত্তম! যে ভেড়া ডাক দিয়ে (অন্যকে উপকৃত হওয়ার জন্য) আহ্বান করে।

হে আমর! আমর জীবনের শপথ! নিশ্চয়ই কাবূস ইবনে হিন্দের (আমর ইবনে হিন্দের ছোট ভাই; পরবর্তী রাজা) রাজত্বকে অচিরেই একদল নির্বোধ লোক তছনছ করে ফেলবে।[117]

ইসলামী ও উমাইয়া যুগঃ

জাহেলী যুগ সমাপ্ত হওয়ার পর শুরু হয় ইসলামী যুগ। ইসলামের আলোতে গোত্রীয় ভেদাভেদ দূর হলেও ধর্মীয় একটি শক্ত বিভাজন তৈরি হয়েছে। তাওহীদবাদী মুসলিমরা ছিলেন নবী মুহাম্মদ (সা) এর নেতৃত্বে একপক্ষে। অপরদিকে মূর্তিপূজক, ইয়াহুদি, খ্রিষ্টানরা ছিল অন্যপক্ষে। তৎকালীন আরব সমাজের জন্য নতুন প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মের প্রতি মানুষের সমর্থন যেমন ছিল তেমনি বিরোধিতাও ছিল। গোত্রীয় সমাজে বসবাসে অভ্যস্ত মানুষেরা গোত্র-বংশ বিবাদ ভুলে গিয়ে ইসলামের ছায়াতলে একত্রে আশ্রয় গ্রহণ করলেও গোত্রীয় ব্যবস্থাপনার কিছু রীতি-রেওয়াজ ভুলে যাননি। তন্মধ্যে একটি হলো কবিতার মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করা। এক্ষেত্রে ইসলামের কুৎসা রটনা করে যেমন কাফের মুশরিক কবিরা কবিতা লিখেছে তেমনি মুসলিম কবিরাও কাফেরদের কুৎসার জবাব দিয়ে কবিতা লিখেছে। তন্মধ্যে হাসসান ইবনে সাবিত অন্যতম। রাসূল (সা) নিজে হাসসানকে রাসূলের পক্ষ থেকে কাফেরদের কবিতার

116 আ.ত.ম মুছলেহউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭।
117 প্রাচী আরবীন কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা ১৮০।

www.nagorikpathagar.org

জবাব দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং দোয়া করতেন স্বয়ং জিবরাঈল যেন এক্ষেত্রে হাসসানকে সহযোগিতা করেন।[118]

মক্কা বিজয়ের পূর্বে হাসসান (রা) রাসূল (সা) এর প্রশংসা ও কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানের নিন্দার মাধ্যমে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতার প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে প্রথমে প্রেয়সীর বাস্তুভিটার স্মৃতিচারণ, প্রেয়সীর বাহন ও উত্তম মদিরার বিবরণ দিয়ে কবি তার মূল বক্তব্য ফুটিয়ে তুলেছেন।[119] নিচে কবিতার মূল অংশটি তুলে ধরা হলো-

عَدِمْنَا خَيْلَنا، إنْ لم تَرَوْهَا   تُثِيرُ النَّقْعَ، مَوْعِدُها كَدَاءُ

ওহে মক্কার কুরায়শ দল! আমাদের অশ্বগুলো হারিয়ে যাক, যদি এগুলো ধূলা উড়িয়ে আমাদের গন্তব্যস্থল 'কাদা' গিরিপথ পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে তথা মক্কা আক্রমণ না করতে পারে।

يُبَارِينَ الأسنّةَ مُصْعِدَاتٍ،   عَلَى أكْتافِهَا الأسَلُ الظِّماءُ

ঘোড়াগুলো এতই দ্রুতগামী যেন লাগামের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। তাদের স্কন্ধে রয়েছে তৃষ্ণার্ত বর্শা (যা শত্রুকে আঘাত হানতে উদগ্রীব)।

تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ،   تلطمهنّ بالخمرِ النساءُ

আমাদের উন্নতজাতের ঘোড়াগুলো সর্বদা দ্রুতগামী; যাদেরকে আমাদের নারীরা স্বীয় ওড়না দিয়ে (ধূলাবালি) ঝেড়ে দেয়।

فإما تعرضوا عنا اعتمرنا،   وكانَ الفَتْحُ، وانْكَشَفَ الغِطاءُ

তোমরা আমাদের বাধা প্রদানে নিবৃত্ত হবে, যেন আমরা নির্বিঘ্নে উমরা পালন করতে পারি। আর মক্কা বিজয় তো অত্যাসন্ন এবং আঁধার পর্দাও কেটে গেছে।

وإلا، فاصبروا لجلادِ يومٍ،   يعزُّ اللهُ فيهِ منْ يشاءُ

নয়তো (যদি কোন বাধা আসে) তোমরা ধৈর্য্য সহকারে সেই লড়াইয়ের দিনের প্রতীক্ষায় থাক, যেদিন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে গৌরাবান্বিত করবেন।

وَجِبْرِيلٌ أَمِينُ اللَّهِ فِينَا،   وَرُوحُ القُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ

আল্লাহর বিশ্বস্ত জিবরাঈল আমাদের সাথেই আছেন। আর এই পবিত্র আত্মার সমকক্ষ কেউ নেই।

118 أهجم يا حسان وروح القدس معك (ওহে হাসসান! তুমি কবিতা দিয়ে কুরাইশ কাফেরদের নিন্দা কর; জিবরাঈল তোমার সাথেই আছেন।

119 حسان بن ثابت الأنصاري، ديوان حسان بن ثابت الأنصاري (بيروت: دار الصادر، 1966م)، ص 7.

www.nagorikpathagar.org

وَقَالَ اللَّهُ: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْداً   يقولُ الحقَّ إنْ نفعَ البلاءُ

আল্লাহ বলেন আমি তো আমি তো একজন বান্দা প্রেরণ করেছি যিনি ন্যায়ের কথা বলেন; যদি পরীক্ষা উপাদেয় হয়।

شَهِدْتُ بِهِ، فَقُومُوا صَدِّقُوهُ! فقلتمْ: لا نقومُ ولا نشاءُ

আমি তাঁকে সত্য নবী হিসেবে সাক্ষ্য দিচ্ছি। সুতরাং তোমরাও যাও, সত্যায়ন কর। কিন্তু তেমারা বললে, ‘ আমরা তাকে মানি না, তাকে চাইনা।

وَقَالَ اللَّهُ: قَدْ يَسَّرْتُ جُنْداً،   همُ الأنصارُ، عرضتها اللقاءُ

আল্লাহ আরো বললেন, ‘ আমি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছি, তারা হচ্ছে আনসার; যারা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত।

لنا في كلّ يومٍ منْ معدٍّ   سِبابٌ، أوْ قِتَالٌ، أوْ هِجاءُ

মা’ আদ গোষ্ঠী (কুরায়শ গোত্র) নিত্যদিন আমাদের সাথে গালিগালাজ, ঝগড়াবিবাদ কিংবা নিন্দাবাদ কোন একটাতে লিপ্ত থাকে।

فنحكمُ بالقوافي منْ هجانا،   ونضربُ حينَ تختلطُ الدماءُ

সুতরাং যারা আমাদের কুৎসা রটায় তাদেরকে আমরা কাব্য পঙক্তি দিয়ে পর্যদুস্ত করি; আর যখন রক্তাক্ত সংঘর্ষ বাধে তখন তরবারি দিয়ে আঘাত করি।

ألا أبلغْ أبا سفيانَ عني،   فأنتَ مجوفٌ نخبٌ هواءُ

ওহে! আবু সুফিয়ানের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দাও। কারণ তুমি তো ভীরু, কাপুরুষ ও অন্তঃসারশূন্য।

وأن سيوفنا تركتك عبدا   وعبد الدار سادتها الإماء

আমার বার্তা হচ্ছে আমাদের অসিগুলো তোমাকে দাসে পরিণত করেছে; আর তোমার বংশ আব্দুদ-দার এর নেতৃবর্গ তো দাসীই ছিল।

هجوتَ محمداً، فأجبتُ عنهُ، وعندَ اللهِ في ذاكَ الجزاءُ

তুমি মুহাম্মদ (সা) এর কুৎসা রচনা করেছ; সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে আমিই জবাব দিব। আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান রয়েছে।

أَتَهْجُوهُ، وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءٍ،   فَشَرُّكُما لِخَيْرِكُمَا الفِداءُ

তুমি কি তাঁর কুৎসা রটনা করেছ? অথচ তুমি তার সমকক্ষ নও; সুতরাং তোমরদের উভয়ের মধ্যে নিকৃষ্টজন উৎকৃষ্টজনের জন্য উৎসর্গীত হোক।

هجوتَ مباركاً، براً، حنيفاً،   أمينَ اللهِ، شيمتهُ الوفاءُ

তুমি নিন্দাবাদ করলে এমন এক ব্যক্তির যিনি পুতঃপবিত্র, নিষ্ঠাবান, সত্যপরায়ণ ও আল্লাহর একান্ত বিশ্বস্ত; যাঁর স্বভাবই হচ্ছে প্রতিজ্ঞাপূরণ।

فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ، ويمدحهُ، وينصرهُ سواءُ

সুতরাং তোমরা আল্লাহর রাসূলের কুৎসা রটাও, প্রশংসা কর আর সাহায্য কর সবই সমান (ইহাতে তাঁর কিছু আসে যায় না)।

فَإنّ أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضي   لعرضِ محمدٍ منكمْ وقاءُ

অতএব, আমার ও তাঁর পিতা এবং আমার সম্মান তোমদের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মুহাম্মদ (সা) এর মানমর্‍যাদার জন্য রক্ষাকবচ হোক।

فإما تثقفنّ بنو لؤيٍ   جُذَيْمَةَ، إنّ قَتْلَهُمُ شِفَاءُ

সুতরাং বনু লুয়াই (রাসূলের বংশ) যদি জুযাইমাকে পেয়ে বসে (পরাজিত করে); তবে তাদেরকে হত্যা করা তো মুসলামানদের জন্য আরোগ্যবিধান।

أولئكَ معشرٌ نصروا علينا،   ففي أظفارنا منهمْ دماءُ

জুযায়মারা তো এমন দল যারা আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করেছে। তবে জেনে রাখ! আমাদের নখ তাদের রক্তে রঞ্জিত।

وَحِلْفُ الحارِثِ بْنِ أبي ضِرَارٍ،   وَحِلْفُ قُرَيْظَةٍ مِنّا بَرَاءُ

আল হারিস ইবনে আবি দ্বিরার এবং বনু কুরায়যার মিত্রগোষ্ঠী আমাদের পক্ষ থেকে দায়মুক্ত।

لساني صارمٌ لا عيبَ فيهِ،   وَبَحْرِي لا تُكَدِّرُهُ الدِّلاءُ

আমার রসনা চরম ধারালো কর্তনকারী, এতে কোন খুঁত নাই; এবং আমার কাব্যিক জ্ঞানসাগরও বালতির পানিতে ঘোলা হবার নয়।

ইসলাম ও কুফরের মধ্যে যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলছিল তন্মধ্যে কেউ কাফের বা অমুসলিম থাকা অবস্থায় ইসলামের কুৎসা রটনা করে কবিতা লিখেছে কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে কবিতার মাধ্যমে ইসলামের সুমহান আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন এবং রাসূল (সা) এর প্রশংসা করেছেন। এক্ষেত্রে কা' ব বিন যুহাইর এর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সহোদর ভাই বুজাইয়ের ইসলামের চেতনা ও আদর্শ গ্রহণ করায় কা' ব আপন ভাইয়ের ও রাসূলের নামে কুৎসা রটনা করে কবিতা লিখেছেন।[120]

ألا أبلغا عني بجيرا رسالة * فويحك فيما قلت ويحك هل لكا

ওহে! তোমরা বুজায়েরের কাছে আমার এই বার্তা পৌঁছিয়ে দাও। ধিক তোমাকে তুমি যা বলেছ তা কি তোমার কথা?

فبين لنا إن كنت لست بفاعل * على أي شيء غير ذلك دلكا

তুমি আমাদেরকে স্পষ্টরূপে বল, যদি তুমি আমার বক্তব্য মেনে না নাও তবে কোন পথে কে তোমাকে পরিচালিত করেছে?

على خلق لم ألف يوما أبا له * عليه وما تلقى عليه أبا لكا

তবে কি এমন কোন আদর্শের প্রতি যার উপর কোন দিন আমি তাঁর (মুহাম্মদ স.) পিতাকে পাইনি এবং তুমিও তোমার পিতাকে (যুহাইন ইবনে আবি সুলমা) পাওনি!

فإن أنت لم تفعل فلست بآسف * ولا قائل أما عثرت لعالكا

সুতরাং যদি তুমি না মান তবে এতে আমার কোন অনুশোচনা নেই; আর তুমি পদস্থলন হলে আমার কিছু বলার নেই। তোমার শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।

سقاك بها المأمون كأسا روية * فأنهلك المأمون منها وعلَّكا

আল- মামুন (মুহাম্মদ স.) তোমাকে পেয়ালাভর্তি শরাবে ভালভাবেই পরিতৃপ্ত করেছে। সুতরাং আল- মামুন বিপন্ন হয়েছে এবং তোমাকে বারবার পান করিয়েছে।

এই খবর রাসূল (সা) জানার পর কা' বকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরক্ষণের কা' ব অনুতপ্ত হয়ে ছদ্মবেশে রাসূলের দরবারে এসে রাসূলের (সা) প্রশংসা দিয়ে কবিতা আবৃত্তি করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল(সা) খুশি হয়ে নিজের গায়ের চাদর কা' ব (রা) কে উপহার দেন। কবিতার প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে কা' ব (রা) তার কবিতা প্রেয়সী বর্ণনা দিয়ে শুরু করেছেন। নিচে কা' ব এর কবিতার মূল কথা চরণগুলো তুলে ধরা হলো- [121]

أُنبِئتُ أَنَّ رَسولَ اللَهِ أَوعَدَني وَالعَفُوُ عِندَ رَسولِ اللَهِ مَأمولُ

আমি এই মর্মে সংবাদ পেয়েছি যে, রাসূল (সা) আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন; তবে আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে ক্ষমা প্রত্যাশিত।

120 الديوان، https://www.aldiwan.net/poem21874.html .

121 "بانت سعادُ فقلبي اليومَ متبولُ (البردة) " **الأدب**، www.adab.com .

مَهلاً هَداكَ الَّذي أَعطاكَ نافِلَةَ ال   قُرآنِ فيها مَواعيظٌ وَتَفصيلُ

একটু থামুন! আপনাকে মহান সত্তা ক্ষমা করার জন্য পথ দেখিয়েছেন, যিনি অতিরিক্ত বদান্যতা স্বরূপ আপনাকে আল- কোরান উপহার দিয়েছেন; যাতে রয়েছে উপদেশমাল ও বিস্তৃত বর্ণনা।

لا تَأَخُذَنّي بِأَقوالِ الوُشاةِ وَلَم أُذِنب وَلَو كَثُرَت عَنّي الأَقاويلُ

কুৎসা রটনাকারীদের কথা আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না, আমার সম্পর্কে লোকমুখে নানা কথা ছড়ালেও বাস্তবে আমি কোন অপরাধ করিনি।

لَقَد أَقومُ مَقاماً لَو يَقومُ بِهِ   أَرى وَأَسمَعُ ما لَو يَسمَعُ الفيلُ

আমি এমন এক স্থানে দাঁড়িয়েছি, দেখছি এবং শুনছি। যদি কোন হাতিও শুনত-

لَظَلَّ يُرعَدُ إِلّا أَن يَكونَ لَهُ   مِنَ الرَسولِ بِإِذنِ اللهِ تَنويلُ

তাহলে সেও সন্ত্রস্ত হয়ে যেত। যদি না আল্লাহর অনুমোদনক্রমে রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা বিধান করা হয়।

حَتّى وَضَعتُ يَميني لا أُنازِعُهُ   في كَفِّ ذي نَقِماتٍ قيلُهُ القيلُ

অবশেষে আমি আমার ডানহাত রাখলাম সেই প্রতিশোধগ্রহণকারীর হাতে উপর যার কথাই প্রকৃত কথা। আর আমি তার সাথে তর্কে লিপ্ত লিপ্ত হইনা।

لَذاكَ أَهَيبُ عِندي إِذ أُكَلِّمُهُ   وَقيلَ إِنَّكَ مَسبورٌ وَمَسؤولُ

আমি যখন তাঁর সাথে কথা বললাম তখন তাকে আমার কাছে আরো অধিক ভয়াবহ মনে হল। বিশেষত আমাকে যখন বলা হল, ‘ তুমি অভিযুক্ত ও জিগ্যাস্য।’

مِن ضَيغَمٍ مِن ضِراءَ الأُسدِ مُخدِرَةً   بِبَطنِ عَثَّرَ غيلٌ دونَهُ غيلُ

তাঁকে সিংহের চেয়েও আরো অধিক ভয়াবহ মনে হল, যে সিংহ ‘ আস- সার’ অরণ্যের গভীরে যার গুহা; যে অরণ্যের গাছগাছালি নিবিড় ঘনছায়া।

وَلا يَزالُ بِوادِيِه أَخَو ثِقَةٍ   مُطَرَّحُ البَزِّ وَالدَرسانِ مَأكولُ

আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তি বরাবরই তাঁর উপত্যকা অতিক্রম করলে উদরস্ত হয়। আর তার হাতিয়ার ও পোশাক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে।

إِنَّ الرَسولَ لَنورٌ يُستَضاءُ بِهِ   مُهَنَّدٌ مِن سُيوفِ اللهِ مَسلولُ

রাসূল (সা) তো এক জ্যোতি, যার কাছ থেকে আলো পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে খাপমুক্ত এক তীক্ষ্ণ তরবারি।

في عُصبَةٍ مِن قُرَيشٍ قالَ قائِلُهُم   بِبَطنِ مَكَّةَ لَمّا أَسلَموا زولوا

মক্কার বুকে কুরায়শের একটি দলসহ যখন ইসলাম গ্রহণ করল তখন তাদের মধ্যে এক বক্তা (হযরত 'উমার) বলেছিলেন, 'তোমরা মক্কা হতে মদীনায় চলে যায়।'

زَالوا فَمازالَ أَنكاسٌ وَلا كُشُفٌ   عِندَ اللِقاءِ وَلا ميلٌ مَعازيلُ

তিনি তাদেরসহ চলে গেলেন; তবে তাঁরা রণক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন না। ঢালবিহীন, অস্ত্রহীন ও সাহসহারাও ছিলেন না।

شُمُّ العَرانينِ أَبطالٌ لَبوسُهُمُ مِن نَسجِ داوُدَ في الهَيجا سَرابيلُ

তারা উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট বীর বাহাদুর। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের বর্ম ও পোষাকসমূহ দাউদ (আ) কর্তৃক তৈরিকৃত।

بيضٌ سَوابِغُ قَد شُكَّت لَها حَلَقٌ   كَأَنَّها حَلَقُ القَفعاءِ مَجدولُ

শ্বেতোজ্জ্বল সুদীর্ঘ সে বর্মসমূহ; এর আংটাগুলো পরস্পর গ্রন্থিত। কা'ফা বৃক্ষের আংটার মত এগুলো অত্যন্ত মজবুত।

يَمشون مَشيَ الجِمالِ الزُهرِ يَعصِمُهُم ضَربٌ إِذا عَرَّدَ السودُ التَنابيلُ

শুভ্র সুদর্শন উটের মত (ধীরগম্ভীর চালে) তাঁরা চলে। কৃষ্ণকায় বেঁটে লোকগুলো যখন পলায়ন করে তখন তাঁদের রক্ষা করে নিজেদের তরবারি।

لا يَفرَحونَ إِذا نالَت رِماحُهُمُ قَوماً وَلَيسوا مَجازيعاً إِذا نيلوا

তাঁদের বর্শাসমূহ শত্রুগোত্রকে আঘাত করলে তাঁরা আনন্দে ডগমগ হয় না; আবার নিজেরা আক্রান্ত হলেও দিশেহারা হয় না।

لا يَقَعُ الطَعنُ إِلّا في نُحورِهِمُما إِن لَهُم عَن حِياضِ المَوتِ تَهليلُ

বর্শার আঘাত কেবল তাঁদের বুকেই লাগে। মৃত্যুর হাউজে ডুব দিতে তারা দ্বিধান্বিত হয় না।

উপরোক্ত কবিতা সবগুলোই আরবী সাহিত্যে রাজনৈতিক ভাবধারার কবিতা হিসেবে পরিগণিত।

উমাইয়া যুগে অসংখ্য কবি সাহিত্যিকদের মধ্য থেকে আখতাল, জারির, ফারাযদাকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। তারা পরস্পর পরস্পরকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখতেন। জাহেলী ভাবধারা অনুযায়ী পরস্পরের গোত্র- বংশকে ইঙ্গিত করে কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু উমাইয়া রাজদরবারের কবি হিসেবে সবচেয়ে বেশি যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তন্মধ্যে কবি আখতাল অন্যতম। কবিরা শাসনকর্তাদের সবচেয়ে বড় যে উপকার করত সেটা হলো কবিতার মাধ্যমে বিরোধী গোষ্ঠীকে হেয় প্রতিপন্ন করে লোকসম্মুখে উপস্থাপন। আর কবি আখতালের এমন কবিতা রচনার করার ব্যাপারে ছিল নিখুঁত মুন্সিয়ানা। উমাইয়া রাজদরবারের এক কবি জু' আয়লের পরামর্শক্রমে বালক বয়সেই আখতাল খলিফা য়াযিদ ইবনে মু' আভিয়ার দরবারে যাওয়ার সুযোগ পান। ভোজন অনুষ্ঠানে য়াযিদের নির্দেশনায় রাজনীতির ময়দানে বিরোধী পক্ষ মদীনার আনসারদের নিন্দা করে আখতাল বলেন, 122

ذَهَبَتْ قُرَيْشٌ بالسَّمَاحَةِ والنَّدَى+ واللُّوْمُ تَحْتَ عَمَائِمِ الأَنصارِ

তথা মহানুভবতা ও বদান্যতায় কুরায়শরা এগিয়ে গেছে; আর আনসারদের পাগড়ির নিচে কেবল হীনতা।

فذَرُوا المَعالِيَ لَسْتُمُ من أَهْلَها + وخُذُوا مَساحِيتَكُمْ بَنى النَّجَّارِ

সুতরাং হে আনসার! তোমরা আভিজাত্য ছাড়, কেননা তোমরা এর যোগ্য নও; বরং তোমাদের বনু নাজ্জার গোষ্ঠীর কোদাল ধর।

উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের প্রশংসা করে রাজদরবারের কবি আখতাল নিচের কবিতাটি রচনা করেন; যা আরবী সাহিত্যের রাজনৈতিক কবিতাসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকলাইন তুলে ধরা হলো- 123

إلى امرئٍ لا تعدّينا نوافلهُ   أظفرهُ اللهُ، فليهنا لهُ الظفرُ

পরিশেষে তারা উপনীত হলো এমন ব্যক্তির (আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান) নিকট যাঁর উপঢৌকন আমাদেরকে লঙ্ঘন করেনা। আল্লাহ তাঁকে সফলতা দান করুক এবং এই সাফল্যে সৌভাগ্যবান হোক।

ألخائضِ الغَمْرَ، والمَيْمونِ طائِرُهُ   خَليفَةِ اللهِ يُسْتَسْقى بهِ المطَرُ

তিনি যুদ্ধের বিভীষিকায় অনুপ্রবেশকারী, তাঁর মঙ্গল পাখি ডান দিকেই ধাবিত। আল্লাহর এমন খলিফা তিনি, যাঁর ওয়াসিলা দিয়ে বৃষ্টি তলব করা হয়।

122 ড.মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪।

123 الأخطل، "خَفَّ القطينُ، فراحوا منكَ، أوْ بَكَروا" http://www.adab.com .

والهمُّ بعدَ نجي النفسِ يبعثُه بالحزْمِ، والأصمعانِ القَلْبُ والحذرُ

কোন বিষয় অন্তরে উদিত হওয়ার পর প্রত্যয় একে দৃঢ় বাস্তবায়ন করে এবং দুই তীক্ষ্ণদর্শন, বুদ্ধিদৃপ্ত অন্তর ও সতর্কতা।

والمستمرُّ بهِ أمرُ الجميعِ، فما يغترهُ بعدَ توكيدٍ لهُ، غررُ

জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড তিনি অব্যাহত রাখেন। দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কোন বিভ্রান্তি তাঁকে প্রতারিত করতে পারে না।

وما الفراتُ إذا جاشتْ حوالبهُ في حافتيهِ وفي أوساطهِ العشرُ

ইউফ্রেটিস নদীর পানি যখন দুকল উপচে পড়ে তখন এর মাঝে উশর বৃক্ষ(খড়কুটা) দেখা যায় (তেমনি তার বদান্যতা সর্বব্যাপি)।

আব্বাসী যুগঃ

যে বিশেষ পেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে উমাইয়া রাজবংশের পতন হয়েছিল সে পেক্ষাপটের প্রভাব আব্বাসী সাহিত্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।[124] আব্বাসী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান বংশগত আরবদের কাছ থেকে নব্যআরবদের হাতে স্থানান্তর হয়েছিল। নব্যআরবরা অধিকাংশ ছিল পারসিক জনগোষ্ঠী। পারসিকদের নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ছিল। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে বসে থাকেনি বরং নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে আবরী ভাষায় রূপান্তরিত করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক ময়দানে সর্বশক্তি দিয়ে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করেছে। বংশগত আরবদের অহমিকার জবাব আব্বাসী বিপ্লব থেকে থেকে শুরু করে আব্বাসী যুগের শেষ পর্যন্ত নব্যআরবরা দিয়েছে। এক্ষেত্রে যেসব কবি-সাহিত্যিকরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল তন্মধ্যে বাশশার ইবনে বুরদ অন্যতম ও অগ্রদূত। বাশশারের কবিতার দু একটি লাইন পড়লেই আব্বাসী সাহিত্যে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিরূপভাবে ফুটে উঠেছে তা সহজে অনুমান করা যাবে।

هل من رسولٍ مخبرٍ+ عنِّي جمِيعَ الْعَرَبِ

منْ كان حيًّا مِنْهُمُ+ومن ثوى في التربِ

জীবিত মৃত সকল আরবকে আমার পক্ষ থেকে এই বার্তা পৌঁছে দেয়ার কোন সংবাদ বাহক আছে কি?

بأني ذو حسب + غال على ذي الحسب

[124] উমাইয়াদের পতনের মূল প্রেক্ষাপট ইতিপূর্বে উল্লেখিত ৩.৫ পরিচ্ছেদে উমাইয়া ও আব্বাসীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে আলোচনা করা হয়েছে।

আমি তো অনেক উচ্চ বংশীয় এবং অভিজাত।

جدِّي الَّذِي أَسْمُوا بِهِ+كِسْرَى ، وساسانُ أبِي[125]

আমার পিতা রোম সম্রাট আর আমার দাদা পারস্য সম্রাট, যাদের নিয়ে আমি গর্ব করি।

উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কবিতা ছাড়াও গতানুগতিক পদ্ধতিতে রাজপ্রাসাদে খলিফার প্রশংসা করে অনেক কবিরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ক্ষমতাসীনদের যারা বিরোধীগোষ্ঠী ছিল তাদের নিন্দা করে কবিতা লিখে পারিতোষিক লাভ করেছেন অনেক কবিরা। সেসব কবিতাসমূহে রাজনৈতিক প্রভাব ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে আবু তাম্মামের নাম আরবী সাহিত্যে সুপরিচিত। আবু তাম্মাম আব্বাসী খলিফা মু' তাসিম এর প্রশংসা করে রাজপ্রাসাদে যেসব কবিতা রচনা করেছেন তন্মধ্যে কিছু চরণ নিচে উল্লেখ করা হলো- [126]

أبقيْتَ جدَّ بني الإسلامِ في صعدٍ + والمُشْرِكينَ ودَارَ الشرْكِ في صَبَبِ

আপনি ইসলামের সন্তানদের ভাগ্য সমুচ্চ রেখেছেন, আর অংশীবাদী ও তাদের গৃহকে নিম্নগামী করে রেখেছেন।

خَلِيفَةَ اللَّهِ جازَى اللَّهُ سَعْيَكَ عَنْ+ جُرْثُومَةِ الدينِ والإِسْلاَمِ والحَسَبِ

ওহে আল্লাহর খলিফা, ধর্মের ভিত্তি, ইসলাম ও মর্যাদার জন্য আপনার এই প্রচেষ্টার প্রতিদান আল্লাহ আপনাকে দান করুন।

بصُرْتَ بالرَّاحةِ الكُبرى فلمْ ترها+ تُنالُ إلاَّ على جسرٍ منَ التَّعبِ

আপনি মহাপ্রশান্তি অবলোকন করলেন তবে তা বহু কষ্টের সেতুর উপর দিয়েই নাগাল পাওয়া গেল।

إن كان بينَ صُرُوفِ الدَّهرِ من رحمٍ + موصولةٍ أوْ ذمامٍ غيرِ مُنقضبِ

যদি কালের ঘটনা প্রবাহের মাঝে পারস্পরিক কোন মিলবন্ধন কিংবা অবিচ্ছেদ্য অধিকার থেকে থাকে,

فبَيْنَ أيَّامِكَ اللاَّتي نُصِرْتَ بِهَا+ وبَيْنَ أيَّامِ بَدْر أَقْرَبُ النَّسَبِ

তাহলে আপনার অর্জিত বিজয়ের দিনগুলোর সাথে বদর যুদ্ধের দিনগুলোর নিকটাত্মীয়ের বন্ধন রয়েছে।

أَبْقَتْ بَني الأصْفَر المِمْرَاضِ كاسِمِهِمُ+ صُفْرَ الوجُوهِ وجلَّتْ أَوْجُهَ العَرَبِ

125 بشار بن برد، "هل من رسولٍ مخبرٍ، **الكلمات**، https://klmat.com.
126 أبو تمام "السَّيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ" ، **الأدب**، http://www.adab.com.

বিজয়ের দিন রুগ্ন বানুল আসফার (বাইজান্টাইনরা) তাদের নামানুসারে ফ্যাকাশে চেহারার হয়ে থাকল, আর আরবদের চেহারা সমুজ্জ্বল হলো

বি. দ্র. উক্ত কবিতাটি বাইজান্টাইনের সুরক্ষিত নগর 'আমুরিয়্যা' বিজয়ের পর খলিফার প্রশংসা করে কবি রচনা করেছিলেন।

পতন যুগ বা তুর্কি যুগ

এই যুগে সাহিত্যের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়। যেমন একদল সাহিত্যিক ছিলেন তারা রাজনীতি, দলাদলি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি নানা কারণে দুনিয়ার প্রতি হতাশ হয়ে সুফিবাদ ও বৈরাগ্যবাদের দিকে ঝুঁকে। উক্ত চিন্তাধারার আলোকে অনেক গল্প কবিতা ও সাহিত্যের অন্যান্য উপাদান রচিত হয়। অপরদিকে বিপরিত চিত্রও দেখা যায়। কেউ কেউ এমন হতাশা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা আর অশ্লীলতায় নিজেদেরকে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন এবং এসব চিন্তার আলোকেও অনেক কবিতা, গল্প সহ সাহিত্যের অনেক উপাদান রচিত হয়েছে।[127]

উমাইয়া ও আব্বাসী আমলের মত আরব কবিরা রাষ্ট্রীয়ভাবে তেমন পৃষ্ঠপোষকা না পাওয়ায় এই যুগে সাহিত্য তেমন উৎকর্ষতা লাভ করেনি। যদিও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় অনেক কাজ হয়েছে। প্রসিদ্ধ কবিপ্রতিভা যারা ছিলেন তারা রাজনৈতিক হাঙ্গামা, দলাদলিকে পূর্বযুগের মত কবিতার বিষয়বস্তু না বানিয়ে নিজেদেরকে বৈরাগ্যবাদের দিকে ধাবিত করেন। আল্লাহ ও রাসূলের প্রশংসা, সূফিবাদ, বৈরাগ্যবাদ এগুলো কবিতার মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে আরবী সাহিত্যে কবি বুসুরি সুপরিচিত। তিনি রাসূল (সা) এর প্রশংসা করে কবিতা লিখার পর স্বপ্নযোগে রাসূল (সা) নিজের চাদর উপহার দেন। সাহিত্যের ইতিহাসে কা�ব বিন যুহাইর এর কবিতার ন্যায় উক্ত কবিতাকেও "কাসিদা বুরদাহ" নামকরণ করা হয়েছে।

আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগের আরবী পদ্য সাহিত্যে রাজনীতির ছাপ একটু ভিন্ন আঙ্গিকে পড়েছে। পূর্ববর্তী যুগের প্রতিভাবান ও প্রসিদ্ধ কবিদের অধিকাংশই রাজা-বাদশাহের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আধুনিক যুগের যেসব কবিতা রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত সেগুলো অধিকাংশই শাসকদের প্রতিবাদে রচিত হয়েছে। ১৭৯৮খ্রি. সালে ফ্রান্সের নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণের পর থেকে আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হয়; যা ইতিপূর্বে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীদের পর এসেছে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা। সাইকস-পিকট গোপন চুক্তির মাধ্যমে উসমানী খেলাফতের অধীনে থাকা আরবের রাষ্ট্রসমূহ ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও ফরাসিরা নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা আরবের নিয়ন্ত্রণ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে চলে যায়। এই সময়ে অনেক কবি প্রতিভা তাদের অসি ও মসি দিয়ে ইংরেজদের অত্যাচারের

[127] হান্না আল-ফাখূরী, তারিখুল আদাবিল আরবী, (বৈরুত: আল মাতবা'আ আল বুলিসিয়্যাহ), পৃ. ৮৬০.

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এজন্য অনেক কবি-সাহিত্যিকরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, সহ্য করেছেন জেল-জুলুম-নির্যাতন। এসমস্ত কবিদের কবিতায় তৎকালিন রাজনীতিক প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। নিচে প্রখ্যাত কবি হাফেজ ইব্রাহিমের এমন একটি কবিতা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হোল।

১৯০৬খ্রি. সালে মিশরের "দিনশাওয়া" নামক স্থানে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্য কবুতর শিকার করতে যান। কবুতর শিকার করতে গিয়ে ইংরেজ সৈন্যদের সাথে স্থানীয় লোকদের সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ মিলিটারি আদালত অনেক নির্দোষ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। কবি হাফিজ ইব্রাহিম ইংরেজদের এই জুলুম ও বাড়াবাড়ি তার কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন এবং ইংরেজদের কাছে তার জাতি কেমন অসহায় ও দুর্বল হয়ে আছে সেদিকেও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

أَيُّها القائِمونَ بِالأَمرِ فينا + هَل نَسَيتُم وَلاءَنا وَالوِدادا

হে আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ! তোমরা কি আমাদের দায়িত্ব ও ভালবাসা ভুলে গেছ?

خَفِّضوا جَيشَكُم وَناموا هَنيئا + وَابتَغوا صَيدَكُم وَجوبوا البِلادا

তোমরা তোমাদের সৈন্যদের উঠিয়ে নাও, নিশ্চিন্তে ঘুমাও এবং বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে শিকারী তালাশ কর।

وَإِذا أَعوَزَتكُمُ ذاتُ طَوقٍ + بَينَ تِلكَ الرُبا فَصيدوا العِبادا

তোমাদের যদি ঐ ভূমিতে গলায় বেড়িওয়ালা কবুতর শিকার করার প্রয়োজন হয় তাহলে তোমরা মানুষ শিকার কর।

إِنَّما نَحنُ وَالحَمامُ سَواءٌ + لَم تُغادِر أَطواقُنا الأَجيادا

আমরা এবং কবুতর উভয়ই সমান। কবুতরের মত আমরাও গলায় বেড়ি পরিহিত।

لا تَظُنّوا بِنا العُقوقَ وَلَكِن+ أَرشِدونا إِذا ضَلِلنا الرَشادا

তোমরা আমাদেরকে অবাধ্য মনে করোনা; বরং আমরা যদি কখনো পথভ্রষ্ট হই তখন আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে।

لا تُقيدوا مِن أُمَّةٍ بِقَتيلٍ + صادَتِ الشَمسُ نَفسَهُ حينَ صادا

নিহত ব্যক্তির জন্য তোমরা আমাদের দোষারোপ করোনা। যে মৃত্যুবরণ করেছে এটার জন্য কেউ দায়ী নয়।

جاءَ جُهّالُنا بِأَمرٍ وَجِئتُم ضِعفَ + ضِعفَيهِ قَسوَةً وَاِشتِدادا

আমাদের মূর্খ লোকেরা একটা কাজ না হয় করে ফেলেছে। কিন্তু তোমরা দ্বিগুন প্রতিশোধ নিয়েছ বরং তারচেয়েও আরো নিষ্ঠুরভাবে।

أَحسِنوا القَتلَ إِن ضَنَنتُم بِعَفوٍ + أَقِصاصاً أَرَدتُمُ أَم كِيادا

যদি তোমরা ক্ষমাকুণ্ঠ হও তাহলে তোমরা যেভাবে ভাল মনে কর সেভাবেই হত্যা কর। কিসাস গ্রহণ কর অথবা চাইলে অন্যকোন ষড়যন্ত্রও করতে পার।

أَحسِنوا القَتلَ إِن ضَنَنتُم بِعَفوٍ + أَنُفوساً أَصَبتُمُ أَم جَمادا

যদি তোমরা ক্ষমাকুণ্ঠ হও তাহলে তোমরা যাকে ভাল মনে কর তাকেই হত্যা কর। সেটা জড় হোক অথবা জীব হোক।

لَيتَ شِعري أَتِلكَ مَحكَمَةُ التَف + تيش عادَت أَم عَهدُ نيرونَ عادا

হায় আফসোস! এটা কি অনুসন্ধানের আদালত নাকি নিরুনের যুগ চলে এসেছে?

كَيفَ يَحلو مِنَ القَوِيِّ التَشَفّي + مِن ضَعيفٍ أَلقى إِلَيهِ القِيادا

দুর্বলদের কাছ থেকে শক্তিশালীরা প্রতিশোধ নেয়া কতটুকু সমীচীন? যেই দুর্বলতা শক্তিশালীর উপর নেতৃত্বস্থাপন করেছে।

إِنَّها مُثلَةٌ تَشُفُّ عَنِ الغَيـ + ـظِ وَلَسنا لِغَيظِكُم أَندادا

অঙ্গ বিকৃতি ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। অথচ আমরা তোমাদের ক্রোধের উপযুক্ত নই।

أَكرِمونا بِأَرضِنا حَيثُ كُنتُم + إِنَّما يُكرِمُ الجَوادُ الجَوادا

তোমরা যেখানেই থাক আমাদেরকে আমাদের ভূমিতে সম্মান কর। সম্মানিত ব্যক্তিরাই অপরকে সম্মান করে।

إِنَّ عِشرينَ حِجَّةً بَعدَ خَمسٍ + عَلَّمَتنا السُكونَ مَهما تَمادى

২৫ বছর আমাদেরকে শান্তিময় পরিবেশ শিক্ষা দিয়েছে তা যতই বিলম্ব হোক না কেন।

أُمَّةُ النيلِ أَكبَرَت أَن تُعادي + مَن رَماها وَأَشفَقَت أَن تُعادى

নীল নদের অধিবাসীরা আজ তীর নিক্ষেপকারীদের বিরোধিতা করাকে কঠিন মনে করে এবং তাদের শত্রুদের ভয় পায়।

لَيسَ فيها إِلّا كَلامٌ وَإِلّا + حَسرَةٌ بَعدَ حَسرَةٍ تَتَهادى

তাদের কেবল ফিসফিস করে কথা বলা আর আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই; যা তারা পরস্পরকে হাদিয়া দেয়।

أَيُّها المُدَّعي العُمومِيُّ مَهلاً + بَعضَ هَذا فَقَد بَلَغتَ المُرادا

হে এটর্নি জেনারেল আপনি এবার কিছু অবকাশ দিন। কেননা আপনার সর্বোচ্চ পদ তো আপনি পেয়েছেনই।

قَد ضَمِنّا لَكَ القَضاءَ بِمِصرٍ+ وَضَمِنّا لِنَجلِكَ الإِسعادا

মিশরের মাটিতে আমরা আপনার চাকুরির নিশ্চয়তা দিচ্ছি এবং আপনার সন্তান-সন্ততির সৌভাগ্যেরও নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

فَإِذا ما جَلَستَ لِلحُكمِ فَاِذكُر + عَهدَ مِصرٍ فَقَد شَفَيتَ الفُؤادا

সুতরাং আপনি যখন বিচারকাজে বসবেন তখন আপনি মিশরকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করবেন। নিশ্চয় আপনি অন্তরসমূহকে আরোগ্য দান করেছেন।

لا جَرى النيلُ في نَواحيكِ يا مِصـ + ـرُ وَلا جادَكِ الحَيا حَيثُ جادا

হে মিশর! নীল নদ যেন তোমার মাঝে প্রবাহিত না হয়। বৃষ্টি যেন তোমাকে সিক্ত না করে।

أَنتِ أَنبَتِّ ذَلِكَ النَبتَ يا مِصـ+ ـرُ فَأَضحى عَلَيكِ شَوكاً قَتادا

তুমি মিশরের ভূমিতে এমন বৃক্ষের জন্ম দিয়েছ যেটা তোমার জন্য কন্টকবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

إِيهِ يا مِدرَةَ القَضاءِ وَيا مَن + سادَ في غَفلَةِ الزَمانِ وَشادا

ওহে বিচারকের এজলাস! ওহে নেতৃত্বলাভকারী ব্যক্তিবর্গ! যুগের পরিবর্তনের কারণে যারা নেতৃত্ব লাভ করেছে এবং শক্তিশালী হয়েছে।

أَنتَ جَلّادُنا فَلا تَنسَ أَنّا + قد لَبِسنا عَلى يَدَيكَ الحِدادا

তুমি আমাদের জল্লাদ! তুমি ভুলে যেওনা, আমরা তোমার দুই হাতেই শোকের পোষাক পরিধান করেছি।[128]

মাহজারি কবি-সাহিত্যিক

উনিশ ও বিশ শতকে আরবের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে লেবানন, সিরিয়া ও মিশর থেকে অনেক কবি-সাহিত্যিকরা আমেরিকার অভিবাসী হয়েছেন। লেবাননে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে দাঙ্গা, রাজনৈতিক অস্থিরতা-গোলযোগ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের খেলনার পুতুল সম শাসকদের রোষানল শত শত মানুষকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। তন্মধ্যে যারা আমেরিকার অভিবাসী হয়ে সেখানে আরবী সাহিত্য চর্চা করেছেন তাদেরকে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে "মাহজারি কবি-সাহিত্যিক"

[128] "حافظ إبراهيم، " أيها القائمون بالأمر فينا " ,**الديوان** , https://www.aldiwan.net .

বলা হয়। এক্ষেত্রে যারা উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস করেছে তাদের সংগঠনের নাম ছিল "রাবিতা আল কলামিয়্যাহ"। ইহা খলিল জিবরানের হাতে ১৯২০খ্রি. সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সংগঠনের সদস্য হিসেবে প্রসিদ্ধ যেসকল কবিরা ছিলেন-

- জিবরান খলিল জিবরান, মিখাইল নু'আইমা, ইলিয়া আবু মাদি, নাসিব আরিদা, , রাশিদ আইয়্যুব, আব্দুল মাসিহ হাদ্দাদ , নাদারাহ হাদ্দাদ, লাইস সাঈদ আগরিব, আমিন মাশরিক, নেয়ামাতুল্লাহ আল হাজ্জ, আমিন রাইহানি।

মাহজারি কবিদের অন্য আরেকটি দল দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল যেমন আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এসব দেশে গমন করেছেন। সেখানে তারা আরবী ভাষা চর্চা করেছেন। তাদের সংগঠনের নাম 'উসবাহ আন্দালুসিয়্যাহ'। উক্ত সংগঠনের সদস্য প্রসিদ্ধ অনেক কবি সাহিত্যিক ছিলেন। যেমন-

-মিশাইল নু'মান মা'লুফ, ফাওযি আল- মালুফ, রাশিদ সালিম, শাফিক মা'লুফ, জর্জ সাইদাহ, ইলিয়াস ফারহাত, আকলুল জার, শুকরুল্লাহ জার, জর্জেস ক্রুম, তাওফিক কুরবান, নাদির যাইতুন, মাহদি সাকাফি, ওমর উবাইদ, ইলিয়া আবু মাদি, ইয়ারা আশ- শালহুব।

মাহজারি কবিদের সবাই তাদের মাতৃভূমি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। মাতৃভূমির পরিবেশ, প্রকৃতি ও মাটির গুণাগুণ বর্ণনা ছিল তাদের কবিতার অন্যতম উপাদান। স্বদেশে ফিরে যাবার পরম আকুতি তাদের কবিতার ভাষাকে করেছে আরো গম্ভীর। অনেক মাহজারি সাহিত্যিকের লেখায় ফুটে উঠেছে হতাশা এবং উৎকণ্ঠা।[129] যেমন- প্রসিদ্ধ মাহজারি কবি ইলিয়া আবু মাদি তার একটি কবিতায় বলেন-

أرض آبائنا، عليك سلام + وسقي الله أنفس الآباء
ما هجرناكِ، إذا هجرناك، طوعا + لا تظني العتوق في الأيناء

তথা হে আমার পিতৃভূমি। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মাসমূহে পানি সিঞ্চন করুক।
হে আমার পিতৃভূমি! আমরা তোমাকে স্বইচ্ছায় ছেড়ে যাইনি। তাই কখনো তোমার সন্তানদের সাথে বন্ধন ছিন্ন করার চিন্তা করোনা।

অন্য একজন প্রসিদ্ধ মাহজারি কবি নে' আমাত আল- হাজ্জ স্বদেশের স্মরণে লিখেছেন-

وداع وداع يا بلادي فإني + أودع مشتاقا إلى العود ثانيا

হে প্রিয় দেশ বিদায়! তবে এই বিদায় পুনরায় ফিরে আসার প্রত্যাশায়।

মাহজারি কবিদের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্খা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে কবি জিবরান খলিল জিবরান এর কবর স্থানান্তরের ঘটনার মাধ্যমে। খলিল জিবরান মৃত্যুবরণ করেছেন

129 مريم عزيز خاني، " المهجري ومدارسه وشعرائه"، **ديوان العرب**، http://www.diwanalarab.com.

www.nagorikpathagar.org

১৯৩১খ্রি. সালে আমেরিকাতে এবং প্রথমবার তাকে সেখানেই দাফন করা হয়। কিন্তু কবির শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে কবিকে ১৯৩২খ্রি. সালে তার আপন মাতৃভূমিতে পুনরায় দাফন করা হয়েছে।

৫. সাহিত্যের দর্শন ও শেষকথা

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বিভিন্ন সময় রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত সাহিত্যের দর্শন মূলত কিরূপ হয়ে থাকে পরিশেষে ইহা উপস্থাপন করা হল।

এক. মোসাহেবি সাহিত্য:

অর্থ উপার্জন ও উন্নত জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে যখন কবি-সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনা করে থাকে তখন তোষামোদের উপাদানে ভরপূর থাকে তাদের সাহিত্যকর্ম। এক্ষেত্রে তোষামোদের মাত্রা যত উচ্চাঙ্গের হবে সাহিত্যমানও হবে তত উচ্চ পর্যায়ের। অর্থাৎ যাকে উদ্দেশ্য করে সাহিত্য রচিত হচ্ছে তার গুণাগুণ যত বেশি স্পষ্ট করে চিত্রায়ন করা যাবে ততই সাহিত্য মান বৃদ্ধি পাবে। এই সাহিত্য কোন বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে উক্ত সাহিত্যের অবকাঠামো তৈরি হয়।

দুই. স্বাধীনচেতা সাহিত্য:

স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের সাহিত্য উপরে উল্লেখিত মোসাহেবি সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিপরিত। কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে এই সাহিত্যের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধ থাকেনা। সাহিত্যিকের পছন্দ, আগ্রহ, আবেগের উপর নির্ভর করে উক্ত সাহিত্যের মৌলিক উপাদান। মানুষের পছন্দ, আগ্রহ, আবেগ সবসময় একরকম থাকেনা বরং পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে পরিবর্তন হয়; তদ্রুপ উক্ত সাহিত্যের অবকাঠামো এবং বিষয়বস্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের হয়।

তিন. অধীনতা, অত্যাচার, অনুযোগ ও অনুরাগ সৃষ্ট সাহিত্য:

অধীনতা ও অত্যাচারের বিতৃষ্ণা একজন সাহিত্যিকের মনকে যখন বিষবৎ করে তুলে তখন মনের ভিতরে একধরণের অনুযোগ ও অনুরাগ সৃষ্টি হয়। বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার আকুতি একই সাথে হতাশা ও ক্ষোভ উক্ত সাহিত্যের প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়ায়।

চার. নির্বাসিত ব্যক্তির সাহিত্য:

ব্যক্তি কর্তৃক স্পষ্ট ভাষায় বিদ্রোহ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হলে কর্তৃত্বশালী শাসকগোষ্ঠীদের নিপীড়ন অনিবার্য। শাসকগোষ্ঠী হয়ত ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে না হয় অন্যকোন উপায়ে তার মুখের ভাষা বন্ধ করার চেষ্টা করে। বহিঃশক্তির ইশারায় দেশে যুদ্ধাবস্থা ও বছর বছর ধরে চলমান গোলযোগের কারণেও কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজ দেশ ছেড়ে ভিন্ন কোন দেশে নির্বাসনে যেতে পারেন। এমতবস্থায় প্রবাস জীবনে একজন সাহিত্যিক কখনো হয়ে উঠেন আপন মাতৃভূমির প্রতি আবেগপ্রবণ। কখনো নিজ দেশের প্রকৃতি, আকাশ, বাতাশ ও নদীর কলকল ধ্বনি তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠে। বেঁচে থাকার ইচ্ছা ও অধিকার ফিরে পাওয়ার সংগ্রাম সাহিত্যিকের মনকে করে চরম আত্মবিশ্বাসী। সাথে সাথে তার সাহিত্যকর্মেও ফুটে উঠে উক্ত আবেগ, অনুভূত আর পরিচ্ছন্ন স্মৃতিচারণ।

পাঁচ. রাজনীতিতে সাহিত্যের প্রভাব:

সাহিত্যকর্মে যেমন রাজনীতির প্রভাব পড়ে তেমনি রাজনীতিতেও সাহিত্যকর্মের প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ একজন সাহিত্যিক যেমন কোন রাজনীতিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে সাহিত্য রচনা করেন তদ্রুপ কোন রাজনীতিক অথবা রাজনৈতিক পরিরিস্থিতিও কোন সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে প্রভাবিত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

1- ফাখূরী, হান্না আল। **তারিখুল আদাবিল আরবী**, বৈরুত: আল মাতবা'আ আল বুলিসিয়্যাহ।
2- করিম, সরদার ফজুল। **দর্শন কোষ**, ঢাকা : প্যাপিরাস, জুলাই ২০০৬।
3- ওদুদ, মো. আবদুল। **রাষ্ট্রদর্শন**, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা: মনন পাবলিকেশন, এপ্রিল ২০১৪।
4- করীম, মুহাম্মদ রেজা ই। **আরব জাতির ইতিহাস**,চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী প্রেস, ২০০৮।
5- রহমান, ডক্টর শেখ লুৎফর। **উসমানীয়া সালাতানাত**, ঢাকা: ই.ফা.বা., ১৯৯১খ্রি., পৃ.৯৮-১০৬।
6- জাব্বুরি, ইয়াহইয়া আল। **আশ শি'রুল জাহেলি**, নবম সং, বৈরুত: মু'আসসাতু আর রিসালাহ।
7- চৌধুরী, ড. মোহাম্মদ ইসমাঈল। **প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন**, প্রথম প্রকাশ,চট্টগ্রাম: আহমদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৫।
8- আয্ যাওযানি। **শরহুল মু'আল্লাকাতিস সাব'ঈ**, মুহাম্মদ ইবরাহিম সালিম সম্পা., কায়রো: দারুত তালা'ই, ১৯৯৩।
9- আমিন , ড. আহমদ। **দুহাল ইসলাম**, মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ অনূদিত,ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০২, খ. ২।
10- হোসাইন ,ত্বহা। **হাদিসুল আরবি'আ**, ১১শ সং,মিশর: দারুল মা'আরিফ, খ. ২।
11- **ইসলামী বিশ্বকোষ**, সম্পাদনা মণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত,ঢাকা: ই. ফা. বা.,১৯৯৫, খ.১৬।
12- আল-জাহিয। **কিতাবুল হায়াওয়ান**, আব্দুস সালাম হারুন সম্পাদিত, তৃতীয় সং, বৈরুত।
13- যায়দান, জুরজি। **তারিখুল আদাবিল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ**, মিশর: দারুল হিলাল, খ. ৩।
14- আস্পাহানী, আবুল ফারাজ আল। অধ্যাপক সামীর জাবির সম্পা.,**আল আগানী**, ২য় সং, বৈরুত: দারুল ফিকর।
15- দায়ফ, ড. শাওকী। **আল ফান্নু ওয়া মাজাহিবুহু ফিশশি'রিল আরবী,কায়রো**: দারুল মা'আরিফ, ২০০৮।
16- যায়্যাত, আহমদ হাসান আয। **তারিখুল আদাবিল আরাবী**, ৬ষ্ঠ সং , বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ, ২০০০।
17- ইবনে হানী, আবু নুয়াস আল হাসান। **দীওয়ানু আবী নুয়াস**, আহমাদ আব্দুল মাজিদ সম্পা., বৈরুত: দারুল কিতাব আল আরবী, ১৯৮২।
18- মুছলেহউদ্দিন, আ.ত.ম। **আরবী সাহিত্যের ইতিহাস**, সপ্তম সং,ঢাকা: ই.ফা.বা, ২০১২ খ্রি.।

19- Watt. **The Cambridge History of Islam**.
20- Watt. **al- Hudaybiya or al-Hudaybiyya Encyclopedia of Islam.**
21- Khan, Majid Ali. **Muhammad the final messenger, 2nd ed., India: Islamic Book Service**, 1998.
22- **The Cambridge History of Islam**, ed. P.M. Holt, Ann K.S. Lambton, Bernard Lewis, Cambridge 1970.
23- Somel. **Selcuk Aksin,The A to Z of the Ottoman Empire**, p.179.
24- Alan, Mikhail. **Nature and Empire in Ottoman Egypt**, Cambridge University Press.
25- Khalid, Yahya Blankinship. **The End of the Jihad State**, the Reign of Hisham Ibn 'Abd-al Malik and the collapse of the Umayyads, State University of New York Press.
26- Rahman, H.U.. **A Chronology Of Islamic History**, ed. 1999.
27- Ibn Kathir. **Al-Bidayah wal-Nihayah**, V. 8.
28- Fitzgerald, Charles Patrick. **China: A Short Cultural History**.
29- Brauer, Ralph W. **Boundaries and Frontiers in Medieval Muslim Geography**, Diane.
30- Mark Erickson, Ljubica Erickson. **Russia War, Peace And Diplomacy.**
31- Imber Colin. **The Ottoman Empire, 1300–1650: The Structure of Power.**
32- Gábor Ágoston; Bruce Alan Masters**. Encyclopedia of the Ottoman Empire**, Infobase Publishing.
33- Howard, Douglas Arthur. **The History of Turkey**, Greenwood Publishing Group.
34- Taylor, A.J.P. **The Struggle for Mastery in Europe**, 1848–1918, Oxford: Oxford University Press.
35- Hansen, Matthew J. Gibney. Randall A.. **Immigration and Asylum: From 1900 to the Present.**
36- Broadberry/Harrison. **The Economics of World War**, Cambridge University Press.
37- Ozoglu, Hakan**. From Caliphate to Secular State: Power Struggle in the Early Turkish Republic.**
38- P.k. hitti. **History of The Arabs.**
39- **An Introduction to the Quran II** (1895).
40- Robert Elsie. **Dictionary of Kosova**, Historica, Scarecrow Press.
41- Kier Elam. **The Semiotics of Theatre and Drama, London and New York: Methuen**.

42- الفاخوري ، حنا. **الجامع في تاريخ الأدب العربي- الأدب القديم**، الطبعة الأولى، بيروت: دار الجيل، 1986م

অভিধান ও বিশ্বকোষ

1- অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান http://www.oed.com/view/Entry/146552।
2- ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা:বা/এ, জানুয়ারি ২০১১।
3- Esposito, John L, The Oxford Dictionary of Islam, ed. 2003.
4- Encyclopædia Britannica, http://www.britannica.com.
5- "Beylerbeyi Palace", Istanbul City Guide.
6- Encyclopedia Britannica, 15th edition.

7- Encyclopaedia of Islam 7 ,2nd ed., Brill Academic Publishers.

গবেষণা পত্র

1- "The Islamic World to 1600", Applied History Research Group, University of Calgary.

2 - روان الحربي وزملائها، "عناصر الأدب"، جامعة الملك السعود،
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/nsr_ldb.docx.

ওয়েবসাইট

1- https://www.aldiwan.net
2- https://mawdoo3.com
3- http://www.somewhereinblog.net
4- https://policoholic.wordpress.com
5- https://www.bissoy.com
6- https://bajroshakti.com
7- http://alhassanain.org
8- https://lostislamichistorybangla.wordpress.com
9- http://www.napoleon-series.org
10-www.britannica.com
11-https://www.lingq.com
12-https://www.aldiwan.net
13- http://www.adab.com
14- http://www.istanbulcityguide.com
15- http://www.turktelekom.com
16- http://www.aljazeera.net
17- http://www.dailysangram.com
18- http://al-hakawati.la.utexas.edu
19- https://www.reuters.com
20- https://www.alukah.net
21- https://www.almaany.com
22- http://www.mmasr.net

অনলাইন প্রবন্ধ

1- খান, আল মামুন। "ছোট গল্প নিয়ে কিছু কথা", ১৩ ই মে, ২০১৬, http://www.somewhereinblog।

2- আর্বনীল। "গল্প , উপন্যাস এবং উপন্যাসিকা কি?" ০৬ ই আগস্ট ২০১৫, http://www.somewhereinblog.net।
3- সরকার, রানা। "রাজনীতি কি?", ১৮ই এপ্রিল ২০১৮, https://policoholic.wordpress.com/2018/04/18।
4- উদ্দিন, মাহতাব। "কেমন ছিল আইয়ামে জাহেলিয়াত?",**বজ্রকণ্ঠ,** Aug 16, 2018, https://bajroshakti.com।
5- খালিদ ফাহাদ। "মঙ্গোল আগ্রাসন এবং বাগদাদ ধ্বংসযজ্ঞ", ইসলামের হারানো ইতিহাস, ১০/০২/২০১৮ইং, https://lostislamichistorybangla.wordpress.com।
6- প্রাক ইসলামী যুগে আরবের অবস্থা। 2015-03-16, http://alhassanain.org।
7- হাসান, ড. কামরুল। " প্রতীকধর্মী আরবি কবিতার সফল কবি সালাহ আব্দুস সবুর ", **দৈনিক সংগ্রাম-অনলাইন**, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬, http://www.dailysangram.com।
8- ইয়াকুব আলী। " সাহিত্য কাকে বলে", 21 জুলাই 2016, http://www.ans.bissoy.com।

9- تمام ، أحمد . " أحمد شوقي.. أمير الشعراء"، **أرشيف إسلام أون لاين**، https://archive.islamonline.net.
10-تسنيم معابرة ."تعريف ميخائيل نعيمة"، **موضوع**، https://mawdoo3.com.
11-"شعراء العصر الحديث." **الحكواتي** ، http://al-hakawati.la.utexas.edu.
12-هديل البكري. "تعريف الأدب"، **الموضوع**، ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ ، https://mawdoo3.com
13-الشهاوي ، الأستاذ صلاح عبد الستار محمد. "التوقيعات الأدبية فن إسلامي خالص"، مجلة الداعي الشهرية، العدد : 9-1، يوليو - سبتمبر 2013م.
14-هماش، فيروز ." ما هي السياسة" https://mawdoo3.com .
15-الخالدي، عمر السنوي " ما الأدب؟ "، **شبكة الألوكة** ، 7/5/2017م، https://www.alukah.net.
16-أنور، أنور محمد. "الأدب العرب- الماضي و الحاضر"، **شبكة مستقبل مصر بالنمسا** ، 23 نيسان/أبريل 2013 ، http://www.mmasr.net.
17-"محمود درويش" ، **الجزيرة، http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/20.**
18-خاني، مريم عزيز . " المهجري ومدارسه وشعرائه"، **ديوان العرب**، http://www.diwanalarab.com.

19- Alexander, Mikaberidze "The Georgian Mameluks in Egypt", http://www.napoleon-series.org.
20- 145th Anniversary of the Circassian Genocide and the Sochi Olympics Issue", Reuters, 22 May 2009, https://www.reuters.com.
21- "History", Türk Telekomh , https://web.archive.org/web/20070928164731/http://www.turktelekom.com.
22- Alexander, Mikaberidze. "The Georgian Mameluks in Egypt", http://www.napoleon-series.org.
23- Stanford Jay Shaw, Malcolm Edward Yapp. "Ottoman Empire" Britannica Online Encyclopedia, Nov 15, 2018, www.britannica.com.
24- Welch Buhl. "Muḥammad".

দিওয়ান ও কবিতা

1- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সোনার তরী/বর্ষাযাপন"।

2 - حافظ، إبراهيم. أيها القائمون بالأمر فينا " ,**الديوان,** https://www.aldiwan.net **.**

3- زهير، كعب بن. "انت سعادُ فقلبي اليومَ متبولُ (البردة) " **الأدب،** www.adab.com **.**

4- الأخطل. "خَفَّ القطينُ، فراحوا منكَ، أوْ بَكَروا" http://www.adab.com .

5- بن برد، بشار. **"هل من رسولٍ مخبرٍ ، الكلمات،** https://klmat.com.

6- تمام، أبو . **"السَّيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِنَ الْكُتُبِ" ، الأدب،** http://www.adab.com.

7 - حسان بن ثابت الأنصاري . ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، بيروت: دار الصادر، 1966م.

8 - معلقة عمرو بن كلثوم . https://www.lingq.com .

9 - معلقة الحارث بن حلزة اليشكري . https://www.lingq.com.